(সংক্ষিপ্তজীবনীসম্বলিত)

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

"নববিধান প্রেস"—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা:
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৯৩৪

মূল্য
কাগজের মলাট—॥০
কাপড়ে বাঁধাই—৸০

ভূমিকা

পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গারোহণের কিছুদিন পূর্ব্বে "ব্রহ্মতত্ত্ব" রচনা করিয়াছিলেন, সময়াভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। পাণ্ডুলিপি কয়েকজন বন্ধুকে দেখান হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই বলিলেন, ইহা অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হইয়াছে ; সম্ভবতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে এরকম বই বাঙ্গালাতে আর নাই। ইংরাজীতে Mr. R. A. Armstrongএর "God and the Soul" বলিয়া একটি পুস্তক আছে, কিন্তু তাহাও অন্য প্রণালীতে রচিত, তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব অন্যভাবে চর্চ্চা করা হইয়াছে। তাহাতে পাশ্চাত্য জড়বাদের (Materialistic) ভাবই বেশী, আধ্যাত্মিক ভাব ততটা নাই। সকলেই বলিলেন, এই পুস্তক প্রকাশ করা উচিত। আমার অতীব ইচ্ছা ছিল, ইহা প্রকাশ করি ; বন্ধুদের এই মত পাইয়া আরও উৎসাহিত হইয়াছি। দেশে ও বিদেশে নানাকারণে অনেকস্থলে ব্রহ্মবিষয়ে একটা সন্দেহের কিম্বা বিতৃষ্ণার ভাব আসিয়াছে। আশা করি, সুধীগণ এবং বিশেষতঃ আমাদের দেশের তরুণগণ এই পুস্তকখানি একটু মনোযোগ ও চিন্তার সহিত পড়িবেন, এবং ব্রহ্ম-বিষয়ে যদি কাহারও মনে কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা ইহা দ্বারা বিদূরিত করিতে পারিবেন।

১০৭ পৃষ্ঠায় "পাপ" ও "পাপীর" বিষয় উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহাতে কেহ যেন মনে করেন না যে, ইহা পাশ্চাত্য "sin" এর ভাবের সঙ্গে একই। পাশ্চাত্য ভাবে "sin" যেন একটা স্বতন্ত্র

জিনিষ, আমরা "sin" লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যেমন তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর একজন স্বতন্ত্র পুরুষ, স্বর্গে সিংহাসনে রাজার মতন বসিয়া আছেন, তিনি বিচার করেন, রাগ করেন ইত্যাদি ; তেমনি একটা ধারণা ছিল যে, মানুষের "original sin" আছে, এবং একজন "Satan" (শয়তান) পুরুষ আছেন। যদিও এভাবটা এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহার প্রভাব এখন পর্য্যন্তও আছে। Mr. Armstrongএর পুস্তকেও "sin" (পাপ) বিষয়ে এই ভাব দিয়া চর্চ্চা করা হইয়াছে। কিন্তু "পাপ" আর কিছুই নহে, ইহা কেবল "অপূর্ণতা"। ১১৮—১২০ পৃষ্ঠায় ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে।

পরিশেষে, আমাকে যাঁহারা এই পুস্তক-প্রকাশে পরামর্শাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমার ভগ্নীপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভাই অক্ষয়কুমার লধ বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন ; পুস্তকের শেষভাগে পিতৃদেবের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল, তাহা প্রধানতঃ প্রথমোক্তেরই রচনা। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসুও অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৯, লোয়ার রডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
১লা বৈশাখ, ১৩৪১।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা

সংক্ষিপ্ত জীবনী—

পরিশিষ্ট—

ব্রহ্মতত্ত্ব

ব্রহ্ম

ভারতবাসীর নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে বর্ণন করিবার আবশ্যকতা নাই। ভারতবাসীর অস্থিমজ্জার মধ্যে এ বিষয়ের ধারণা নিহিত হইয়া রহিয়াছে। চিরদিনই সকলে বুঝেন যে, ব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে জীবন বৃথা। ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই জীবনে সারবস্তু লাভ হয়; মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ইহাতেই হয় এবং সংসারে সুখ শান্তি লাভ হয়, এবং যে পরিমাণে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেই পরিমাণে জীবন রসাল হয় এবং সফল হয়। ভারতের ঋষিরাই 'হরিনাম কল্পতরু অনন্ত রত্নের খনি' বলিয়াছেন। বাস্তবিক এই ব্রহ্মরস হইতে মানব-জীবনের সকল রস সমুৎপন্ন হয়। এবং যদি তাহাই হয়, তবেই জীবন সুখের হয়; নতুবা সুখ সম্পদ্ যত কিছু প্রাপ্ত হইয়াও, মানুষ যথার্থ সুখী হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য সে জন্যই ভারত চিরদিন কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন। জীবদেহের মধ্যে এক রক্তরসই যেমন পরম রস, দেহের সকল অংশকে ও পদার্থকে সমভাবে পুষ্ট করে, এবং ইহার অভাবে দেহ শুষ্ক হয়, বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মরস জীবনে

ও সংসারে সকল বিষয়েরই সৌষ্ঠব করে। ভারতে চিরদিন এই ব্রহ্ম গুণানুকীর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। এইজন্যই, বোধ হয়, ব্রহ্মতত্ত্ব ভারতে যত গভীর ও সুললিতরূপে অনুশীলিত হইয়াছে, এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। ব্রহ্মেতে সঞ্জীবিত থাকিবার আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর সতত প্রবল। যাঁহারা সমর্থ হয়েন, তাঁহারা আপনাদের ধন্য মনে করেন। যাঁহারা অক্ষম, তাঁহারা বাহ্যিক সহস্রপ্রকারে ক্ষমতাপন্ন হইলেও, আপনাদিগের জীবনকে যথার্থ সুখের জীবন মনে করেন না; অন্তরে অন্তরে এক প্রকার হীন-ভাব-বোধক বিষাদ থাকিয়াই যায়। সাধু ভক্ত সন্ন্যাসী প্রভৃতি লোকের প্রতি ভারতে যে এত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ দেখা যায়, তাহার এক প্রধান কারণ মূলতঃ ইহাই।

জগতের মধ্যে ভারতের যেন এই একটী বিশেষ কার্য্য—ইহারই জন্য যেন ইহার সৃষ্টি ও অবস্থিতি—যে সমগ্র ধরা মধ্যে ব্রহ্ম-গুণানুকীর্ত্তন করিয়া সমগ্র বিশাল মানব-বংশকে প্রকৃতরূপে ব্রহ্মানুগামী করিয়া তুলিবে। বোধ হয়, যেন য়ুরোপে মানুষের উদ্যমশীল কার্য্যকারী শক্তিগুলির প্রাখর্য্য-প্রদর্শনের বিশেষক্ষেত্র রহিয়াছে, এসিয়া গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চিন্তাশক্তির প্রয়োগের স্থল। ইংলণ্ড স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রবলরূপে প্রদর্শন করেন—ফ্রান্স মনোহর রুচিজনিত মনুষ্যত্বের পরিচয় দেন। এইরূপ এক এক দেশ যেন এক একটী বিশেষ গুণের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইয়া সৃজিত হইয়াছে। বিধাতার যেন এই সংকল্প যে, সেই সেই গুণ সেই সেই স্থান হইতে বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়া, জগতের সকল দেশকে ক্রমে অনুরঞ্জিত করিয়া, সমস্ত মানব-বংশকে সমগ্রভাবে সমুন্নত করিবে।

এইরূপ সংকল্পের মধ্যে ভারত যেন ব্রহ্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিবেন, মনে হয়। ইহাতে কোনও বিশেষ দেশেরই স্পর্দ্ধা অহঙ্কারের কোন অবকাশ নাই। এ সকল ব্যবস্থা বিধাতারই। তিনি যাঁহাকে যে গুণ দিয়াছেন, তিনি তাহারই আধার হইয়াছেন। প্রত্যেকেই অতি যত্ন সহকারে তাঁহার নিকট গচ্ছিত বিষয়টীকে পরিপালন ও সম্বর্দ্ধন করিয়া জগতে তাহা প্রচার করিবেন।

ভারতের অধিবাসীর সেইজন্য ইহাই কর্ত্তব্য এবং ইহাই তাঁহার বিশেষ কার্য্য যে, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অভিলাষী হইয়া ও তাহা অর্জ্জন করিয়া, জগতে তাহা প্রচার করিবেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান সামান্য জ্ঞান মাত্র নহে, ইহা জীবনভেদী সামগ্রী ; একেবারে রক্তে মাংসে সম্পূর্ণরূপে নিহিত ভাববিশিষ্ট হওয়া চাই। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য পুরাকালে ভারতের যোগী ঋষি সাধু মহাত্মারা কতই না কষ্ট স্বীকার করিযাছিলেন। তাঁহাদের মত সাধনা করিলে, তবে এ জ্ঞান লাভ হইতে পারিবে। তাঁহাদেব সাধন-গুণেই তাঁহারা মধুর ব্রহ্মতত্ত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাইয়াছিলেন এবং মহৎ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা সে পরিমাণে জগতে অন্য কোথাও প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, ইহা অতীব সন্দেহের বিষয়। তাঁহারাও যে টুকু পাইয়াছিলেন, তাহাও বলিতে গেলে সামান্যই ; কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব অনন্তসাগর-সদৃশ, ইহার সীমা বা অন্ত নাই। অধুনাতন ভারতবাসী আমরা সকলে তাঁহাদেরই বংশধর। আমরা কেবল মাত্র তাঁহাদের অর্জ্জিত সামগ্রীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়াই আমাদের কার্য্য সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হইল, মনে করিতে পারি না।

আমাদিগকে তাঁহাদের অনুকরণে নিয়ত কঠিন সাধন করিয়া আরও নূতন তত্ত্ব লাভ করিতে হইবে, এবং নিজ জীবন দ্বারা উক্ত তত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে লাভ হইয়াছে দেখাইয়া, জগদ্বাসী মানববংশের নিকট তাহা প্রচার করিতে হইবে। ইহাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ও জীবনের কার্য্য। সকলের অস্থিমজ্জায় ব্রহ্মজ্ঞানের গৌরবের ভাব নিহিত আছে সত্য ; কিন্তু তাহাকে জীবন্ত করিয়া, ভারতকে স্বর্গ-সদৃশ করিয়া, জগন্ময় ঐ গৌরব সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতের সম্মুখে এই কার্য্য। ইহারই জন্য ভারত অগ্রসর হইতেছে। আমরা সেই মহামূল্য ব্রহ্মতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সকল দেশে সকল স্থানেই, যেখানে মানবজাতি বাস করে, সেই সেখানেই কোনও না কোন আকারে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত আছে যে, (একজন) ভগবান্ আছেন। যাঁহারা দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিবেন। লোকমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্ম আছে বলিলেই এই কথা বলিতে হইবে যে, বিধাতা আছেন, ভগবান্ আছেন, সকলে ইহা বিশ্বাস করে। ধর্ম্মমন্দির, দেবালয়, পূজার স্থান, স্তূপ, চৈত্য ইত্যাদি সকলই ইহার প্রমাণ। অবশ্য এমন দেশও আছে, যেখানকার লোকেরা এখনও সভ্যতার তাদৃশ স্তরে পঁহুছায় নাই যে, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বাহ্যিক আকারের পূজার কোন চিহ্ন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তথাপি অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় যে, তাহারা অন্তরে কোন এক প্রকার বিশ্বাস পোষণ করে। সুতরাং একথা অবাধে স্বীকার করা যাইতে পারে যে, মানব-বংশে ঈশ্বরে

বিশ্বাস ন্যূনাধিকরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, মানুষের এই বিশ্বাসের মূল কি? এখন এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করা যাউক।

সাধারণ লোক বলিবে যে, সে ভগবান্‌কে মানে এইজন্য যে, তাহার দেশীয় শাস্ত্রেতে ভগবান্‌কে মানিতে বলে। হিন্দু তাঁহার শাস্ত্র বেদ, পুরাণ, গীতাদির উল্লেখ করিবেন; মুসলমান তাঁহার কোরাণ-সরিফের, খৃষ্টীয়ান তাঁহার বাইবেলের উল্লেখ করিবেন ও বলিবেন যে, শাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়া তিনি ভগবান্ মানেন। কিন্তু যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তিনি সে শাস্ত্র মানেন কেন? হয়তো তিনি উত্তরে বলিবেন যে, লোকেরা সকলে মানেন, সেই জন্য তিনিও মানেন এবং সে শাস্ত্র ভগবানের কৃত জিনিষ। ফল কথা এই দাঁড়ায় যে, তিনি শাস্ত্র মানেন, ভগবান্ শাস্ত্র করিয়াছেন বলিয়া—আবার ভগবান্‌কে মানেন, শাস্ত্র ভগবান্‌কে মানিতে বলে বলিয়া। এইরূপ নির্দ্দেশ একটা গোলকধাঁধার মতন—এইটা কেবল ঐটার জন্য এবং ঐটা কেবল এইটার জন্য—সুতরাং এই রূপ বলা এই বিশ্বাসের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিবার পক্ষে উপযুক্ত উত্তর হইল না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ ভগবান্‌কে মানে এবং সেই জন্যই তাঁহার প্রকাশিত শাস্ত্রকে মানে। প্রথম বিশ্বাস ভগবানে, তৎপরে তাঁহার প্রকাশিত শাস্ত্রে। অতএব সেই প্রশ্নই পুনরায় উঠে যে, ভগবানে প্রথম বিশ্বাস কি জন্য মানুষের মনে উপস্থিত হয়।

শাস্ত্রের দোহাই দিলে ইহার প্রকৃত কারণ দেখান হয় না এবং ঐ প্রশ্নের উত্তর অনির্দ্দিষ্টই থাকিয়া যায়। শাস্ত্র মানিয়া চলে বলিয়া শাস্ত্রের দোহাই দেয়, নতুবা ভগবানে বিশ্বাস শাস্ত্র মানিবার অগ্রে

হওয়া চাই; তাহা না হইলে ভগবানের নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র মানিবে কেন?

ভগবানে বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অধিকাংশ লোক হয়ত বলিবেন যে, এই যে চারিদিকে জগৎ ও সৃষ্টি দেখিতেছি—এই যে জগতের ভিতর জীবের জন্ম, ও কত সুখ স্বচ্ছন্দতা এবং পরে মৃত্যু—এই যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে,—এ সকল ভগবান্‌দ্বারা না হইলে কি প্রকারে হইতে পারে? ভগবান্ এ সকল না করিলে এ সকল করে কে? মূলতঃ এ কথা সত্য বটে; কিন্তু এই সকল দেখিয়াই যদি তাঁহাকে এই সকলের কারণ বলিয়া আমাদের তাঁহাকে মানিতে হয়, আমরা মনে করিব যে, তিনি খুব প্রকাণ্ড; কিন্তু অনন্ত, যাঁহার সীমার অন্ত নাই, সেরূপ কেন তাঁহাকে বিশ্বাস করি? জগতের সকল পদার্থ, অত্যন্ত বড় হইলেও অন্তবিশিষ্ট—এ সব সান্তের বিষয় লইয়া অন্তহীনের, অনন্তের কথা আমাদের মনে আসিবে কেন? ইহার কোন কারণ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, জগতে যাহা সব দেখিতেছি, তাহা ক্রমাগতই পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। আমরা কেন সেই চলিয়া আসাই মনে করি না? ইহার আবার কোন কারণ আছে, তাহা কেন মনে করিব? যাহা হইতেছে, তাহা হইয়াই থাকে, তাই হয়; তাহার কারণ আছে কেন মনে করিব? সুতরাং এ সকল কথা মনে করিলে, এ প্রশ্নের এ উত্তরও সমধিক সন্তোষজনক হয় না। এই প্রকার হেতু উল্লেখ করিয়া কোন কোন জড়বাদী পণ্ডিত সংশয় করেন যে, তবে ঈশ্বর আছেন কি না, তাহার প্রকৃত প্রমাণ নাই। এবং সে জন্য তাঁহারা বলেন যে, ভগবানে যে বিশ্বাস,

তাহা কেবল মানুষের কল্পিত কল্পনা মাত্র। এ বিশ্বাস মঙ্গল-জনক দেখিয়া মানুষে এই কল্পনাকে গ্রহণ করিয়াছে, এবং ক্রমাগতই জনশ্রুতি-প্রবাহে ইহা লোকে গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, নতুবা ইহার কোন প্রকৃত তাৎপর্য্য নাই। অনেক অনেক কল্পনা মনুষ্য-সমাজে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ইহাও একটী। তাঁহাদের এইরূপ সংশয়-প্রদর্শনে মনুষ্য-সমাজের প্রভূত উপকার আছে; কারণ, ইহা হইতেই এই বিশ্বাসের মূলকে বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া, প্রকৃত ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, এবং তদ্দ্বারা বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। কিন্তু যাঁহারা এই সংশয় পোষণ করেন, তাঁহারা উপযুক্তরূপে বিবেচনা করেন না যে, তাঁহাদের এরূপে বর্ণিত কল্পনা প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা যেমন বলিতেছেন, সেইরূপে মনুষ্য-সমাজে প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর কি না। মনে রাখা আবশ্যক যে, এই বিশ্বাস মনুষ্য-সমাজে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। সভ্যজাতি মানব ভাল মন্দ ফলাফল বিচার করিতে সমর্থ হইতে পারেন এবং এই কল্পনা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন; কিন্তু হীনপ্রকৃতির অসভ্য লোকেরা কি এ প্রকার বিচার করিতে পারে, এবং বিচার করিয়া এরূপ একটা কল্পনা প্রবর্ত্তিত করিতে পারে? ইহা সম্ভবপর নহে। অপর কথা—মানুষের কল্পনার ভিতর মূলতঃ তাহাই থাকে, যাহা তাহারা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, জানিয়াছে, ব্যবহার করিয়াছে—ইহা অতিক্রম করিয়া কল্পনা যাইতে পারে না। মানুষের সমস্ত ব্যবহারের বিষয়ই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ কল্পনায় অনন্তের—সীমাবিহীনের—বিশ্বাস সংযোজিত রহিয়াছে যে, সে ভাব কোথা হইতে আসিতে পারে, কোনও কারণ

তাহার নির্দ্দেশ করা হয় না। সুতরাং ভগবানে বিশ্বাসকে মানুষের একটী কল্পনা মাত্র বলিয়া ছাড়িয়া দিলে, এ প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর হইল না।

এই সকল আলোচনায় দেখা গেল যে, মানুষের ভগবানে বিশ্বাসের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে আমরা প্রকৃত উত্তর পাইলাম না। এখন এ সম্বন্ধে আরও নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান আবশ্যক। এ আলোচনা অতি সাবধানে শুদ্ধচিত্তে অতি নিরপেক্ষ ভাবে করিতে হইবে।

জগতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা কেবলমাত্র মনুষ্য-সমাজেই আছে, অন্য কোনও জীবের ভিতর নাই; ইহার অধিকার কেবল মনুষ্যেরই আছে, আর কোন জীব জন্তুর নাই। কিছুতেই মনে হয় না যে, নিকৃষ্ট জীবেরা এ বিষয়ে কোনই মনোযোগ দেয়। বলা যাইতে পারে যে, নিকৃষ্ট জীবের প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষ এখনও অল্প বুঝে, বিশেষ কিছু জানে না; কিন্তু ইহা পরিষ্কাররূপে দেখা যাইতেছে—ও কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে—তাহাদের প্রকৃতি আর যাহাই হউক না কেন, তাহাতে ধর্ম্ম ও নীতির ভাব নিশ্চয়ই নাই। অর্থাৎ তাহাদের প্রকৃতি আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্ম ও নীতিমূলক নহে। জীবের প্রকৃতি এতন্মূলক না হইলে, কোন জীবের কি ভগবান্‌কে অনুভব করা ও বুঝা সম্ভব? ভগবান্ সম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা ভাবিতে পারি, সে সকল হইতেই আমরা এই দেখি যে, তিনি মহান্ আত্মা—আত্মিকভাববিশিষ্ট সত্তা। সুতরাং যে জীবের নিজের ভিতরে এই আত্মিকভাব নাই, তাহার পক্ষে ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। অতি সামান্যভাবে ব্রহ্ম-প্রকৃতি বুঝিতে হইলেও নীতিজ্ঞানের

ও আত্মিকজ্ঞানের ধারণার নিতান্ত প্রয়োজন। নিকৃষ্ট জীবদের প্রকৃতি অনুশীলন করিলে কিছুতেই মনে হয় না যে, এরূপ জ্ঞানের লেশমাত্রও তাহাদের ভিতর আছে। এস্থলে পরিষ্কাররূপে বলা যাইতে পারে যে, এ জগতে ভগবান্‌কে জানিবার অধিকার কেবল একমাত্র মানবেরই আছে এবং অন্য কোন জীবের নাই।

এখন দেখা যাউক, মানবের এই অধিকার হইতে এবং তাহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি হইতে কিরূপে মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞানে উপস্থিত হইতেছে।

উপরোক্ত আলোচনায় এই বিচারে উপনীত হওয়া গেল যে, যেভাবে সামান্যলোকেরা অথবা কোন কোন সংশয়বাদী পণ্ডিতেরা এই ব্রহ্মজ্ঞানের সমুত্থানের কথা বলেন, তাহার মূলে কোন সত্য নাই। অতএব এই আলোচনা আরও নিগূঢ়ভাবে হওয়া আবশ্যক। এই আলোচনা উপযুক্তভাবে করিতে হইলে, জগতে যে সমুদায় পদার্থ ও জীব আছে, তাহাদের প্রকৃতির প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। পরিষ্কার মনে হয়, যেন পদার্থ সকল ও জীব সকল ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর সত্তা (existence), প্রাণশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও নীতিশক্তি প্রাপ্ত হইয়া, উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে অধিষ্ঠিত হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহাদের সর্ব্বোচ্চে মনুষ্য স্বাধীন, প্রকৃত জ্ঞান ও নীতিবিশিষ্ট আধ্যাত্মিক প্রকৃতি লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। এই সোপানের প্রত্যেক জাতীয় পদার্থ ও জীব সেই পরিমাণে ঐ সকল উপযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট হইয়াছে, যে পরিমাণে সেই সেই পদার্থ ও জীব বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী ও সমঞ্জসীভূত হইয়াছে ও যতদূর তাহাদের বিশেষ বিশেষ

প্রকারের জীবনধারণের ও জীবনযাপনের উপযোগী ও তজ্জন্য প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ও সম্যক্ অনুসন্ধান এক অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার; কারণ তাহারই অন্তর্ভূত হইয়া জগতের সকল প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান গঠিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে প্রবেশ করিতে আমাদের সামর্থ্যও নাই, সাহসও নাই; পরন্তু তাহা আমাদের এক্ষণে প্রয়োজনও নহে। কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট ইহবে যে, যাহা মাত্র জড়বস্তু, তাহার কেবল সেই গুণ ও শক্তি আছে, যাহা তাহার কোন জড়গুণ ও জড়াস্তিত্বের জন্য সর্ব্বপ্রকারে প্রয়োজন। যে সকল পদার্থ দানাদার (crystal), তাহাদের দানা বাঁধিবার উপযোগী গুণই আছে। তদ্রূপ উদ্ভিদ্ এবং উদ্ভিদ্ ও জীবের মধ্যবর্ত্তী জীব (zoophytes) এবং সকল জীব ও সর্ব্বোপরি মনুষ্য প্রত্যেকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী তেজঃ-শক্তি, জীবনশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও নীতিশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন একটা অম্লপদার্থ (acid) অথবা বাষ্প (gas) ও তদ্রূপ অন্য পদার্থ যেন জানে অর্থাৎ তাহার জ্ঞান হয় (যদি 'জ্ঞান' শব্দ এ স্থলে ব্যবহার করা যাইতে পারে) যে, সে একটী ক্ষার পদার্থের (salt) অথবা অপর একটী গ্যাসের সংস্রবে আসিয়াছে এবং সেই সংস্রবেতে আসিয়াই উহাকে তখনই কার্য্য করিতে হইবে, এবং সেইরূপ কার্য্য করিয়া তাহার উপযুক্ত ফলও উৎপন্ন করে। রাসায়নিকভাবে (chemically) যখন কোন এক বস্তু অন্য কোন বস্তু বিশেষের সহিত মিলিত হয়, তখন কে যেন তাহাদের বলিয়া দেয় যে, তাহারা পরস্পরে বিশেষ বিশেষ পরিমাণে, এবং কেবল সেই পরিমাণেই এবং অন্য পরিমাণে নয়, মিলিত হইবে। একরাশি কোন পদার্থ

যদি একদিকে থাকে ও অন্যরাশি এক পদার্থ অন্যদিকে থাকে, একের সকলগুলি অপরের সকলগুলির সঙ্গে মিলিত হয় না, কেবল বিশেষ পরিমাণে মাত্র মিলিত হয়, বাকীগুলি অবশিষ্ট রহিয়া যায়। এই যে তাহাদের ব্যবহার, ইহা দেখিলে মনে হয় যে, যেন তাহারা বোঝে বা জানে, তাহাদের জ্ঞান বা অনুভূতি আছে, অথবা কে যেন তাহাদের বলিয়া দেয় যে, ঠিক এই এই পরিমাণে তাহাদের মিলিত হইতে হইবে, অন্য ভাবে নহে। 'জ্ঞান' শব্দটী ঠিক এখানে ব্যবহার করা যায় না—জ্ঞান বলিলে বুঝায় যে, জ্ঞাতসারে জানা—সুতরাং ঠিক 'জ্ঞান' না বলিলেও ঠিক জ্ঞানের অনুরূপ কার্য্য হয়। আমরা ইহাকে গুণ অথবা ধর্ম্ম (property) বলি। কিন্তু ইহা আর কিছু নহে, জ্ঞানশক্তিই; কেবল জড়ের মধ্যে জড়ের উপযোগী ভাবে, তাহারই সামঞ্জস্য গ্রহণ করিয়া এইরূপে প্রকাশিত ও অবস্থিত হইতেছে। জড়েতে জ্ঞান প্রকাশিত হইতেছে, তাহা এইরূপ জড়াকারেই প্রকাশিত ও লক্ষিত হইতেছে। সেইরূপ নীতিশক্তি, প্রেম আকর্ষণ আকারে, অথবা তাহার বিপরীত আকারে প্রকাশিত হইতেছে। জড় সম্বন্ধে এ সকলকে আমরা বলি, এ সমুদায় জড়ের গুণ। আমরা এ সকলকে জড়েতে জ্ঞান কি প্রেমের প্রকাশ বলি না। যাহা হউক, শব্দ লইয়া, নাম লইয়া বিতণ্ডার কোন প্রয়োজন নাই, প্রকৃত বিষয় দেখিলেই যথেষ্ট হইবে। জগতে সমস্ত সৃষ্টিময় এই যে শক্তিগুলি এইরূপে অন্তর্নিহিতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে এবং বিভিন্ন পাত্রে, পদার্থে ও জীবে বিভিন্ন আকারে সেই সকল বিকশিত হইতেছে, ইহা উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন। সেতার যন্ত্রের তার এক হইলেও পর্য্যায়ভেদে তাহার

ঝঙ্কার বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ একই তেজঃশক্তি, প্রাণশক্তি, জ্ঞানশক্তি, নীতিশক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থ ও জীবে, সেই সেই পদার্থের ও জীবের প্রকৃতি ও জীবনের ব্যবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন। জড়ে যে তেজ, কিম্বা জ্ঞান বা নীতির প্রকাশ, তাহা inertia, রাসায়নিক সম্মিলনের অনুভূতি ও আকর্ষণাদিরূপে প্রকাশিত হইতেছে। সমস্ত জগন্ময় এইরূপই পরিলক্ষিত হয়।

উদ্ভিদের মধ্যেও এই রূপই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের কার্য্য অনুশীলন করিলে মনে হয়, যেন তাহাদের জ্ঞান আছে। প্রসিদ্ধ ডাক্তার Sir জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ইহাদিগের জীবন ও কার্য্যের নিগূঢ় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত আছেন। ইহাদিগের মধ্যে জড়গুণও আছে এবং তদ্ব্যতীত জীবনেরও গুণ আছে। ইহাদের মূলগুলি কেমন সুন্দররূপে মাটীর নীচে বিস্তৃত হইয়া যায়—এবং চারিদিক্ হইতে খুঁজিয়া জীবনধারণের উপযোগী রস আকর্ষণ করে। এবং যদি কোন বাধা পায়—ইট, পাথর ইত্যাদি পথে আসিয়া প্রতিবন্ধক-রূপে উপস্থিত হয়, তখন কেমন সুন্দররূপে দক্ষতার সহিত সে সকল বাধা অতিক্রম করে এবং আবশ্যকীয় রসাকর্ষণ-কার্য্য সংসাধন করে; মনে হয়, যেন তাহারা বুঝিতে পারে, কি উপায় অবলম্বনে কি ফল হইবে। লতান গাছের সূত্রগুলি কেমন আশ্চর্য্যভাবে নিকটস্থ অবলম্বনগুলির দিকে যায় এবং ক্রমে তাহাদের গায়ে জড়ায়। কোন খুঁটি বা অবলম্বন নিকটে আছে, কিন্তু সংলগ্ন নহে, অথচ সূত্রগুলি কেমন আশ্চর্য্য ভাবে সেই দিকে অগ্রসর হইতে থাকে—ক্রমে দু'একদিন মধ্যেই দেখা যায় যে, সূত্রগুলি সেই দূরস্থ খুঁটি বা অবলম্বনকে স্পর্শ করিয়া তাহার আশ্রয় লাভ করিয়াছে। সূত্রগুলি

যেন জানিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের আশ্রয়ের জন্যই যেন ঐ অবলম্বন অবস্থিত। এইরূপ জ্ঞান সেই লতা-জীবনের জন্য প্রয়োজন এবং সে জন্য লতার ভিতর এই জ্ঞান এই আকারে অবস্থিত। ইহাকে প্রকৃত জ্ঞান না বলিলেও, ইহা জ্ঞানেরই অনুরূপ —সেই প্রকার অনুরূপ, যাহা উদ্ভিজ্জীবনে প্রকাশ পাইতে পারে।

জীবরাজ্যের মধ্যেও সেইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। নিতান্ত নিকৃষ্ট জীব, যেমন কীটাণু কিম্বা ছোট ছোট পোকা মাকড়, ইহাদের মধ্যেও জ্ঞানশক্তি, নীতিশক্তি ইত্যাদি তাহাদেরই প্রকৃতি ও জীবনের উপযোগী ভাবে অবস্থিতি করিতেছে—তাহাদের জীবন-যাপনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই আছে। সেইরূপ আরও উচ্চশ্রেণীর জীবের বিশেষ বিশেষ জীবনের সামঞ্জস্য ও প্রয়োজন মত এই সকল শক্তি তাহাদের জীবনের উপযোগী হইয়া অবস্থিতি করে। তাহাদের মধ্যে জড়ের গুণও আছে এবং উদ্ভিদের গুণও আছে, তদ্ব্যতীত এমন বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে, যাহা হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ রকমের বুদ্ধি এবং কখন কখন এক প্রকার নীতিশক্তিও প্রকাশ পায়। তাহা ছাড়া আরও দেখা যায় যে, কোন কোন জীবের ভিতরে এক এক প্রকার সংস্কার (instinct) আছে। এই সকল সংস্কার বশতঃ তাহারা এমন সকল কার্য্য করে, যাহাতে বিশেষ উচ্চ প্রকারের জ্ঞান এবং কখন কখন অতি সুন্দর নীতি প্রকাশ পায়। মধুমক্ষিকা যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, তাহাতে প্রত্যেক ঘরগুলি ষট্‌পার্শ্ববিশিষ্ট (hexagonal)। এই চক্রে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সংখ্যায় যত বেশী প্রকোষ্ঠ হওয়া সম্ভব নির্ম্মিত হয়। ইহা গণিতশাস্ত্রজ্ঞ মনুষ্য আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারেন।

মধুমক্ষিকার গণিতবিদ্যা-চর্চ্চা নাই, তাহাদের মনুষ্যের মত জ্ঞান কিম্বা শাস্ত্রও নাই ; তথাপি মধুচক্র-নির্ম্মাণকালে সংস্কারবশতঃ উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক গভীর সত্য উপলব্ধি করিয়া কার্য্য করে। মনে হয়, যেন উহারা ঐ সত্যটী বেশ বুঝিতে পারে। সেইরূপ ক্ষুদ্র পিপীলিকারা, মনে হয়, যেন কত নীতিপরায়ণ মিতব্যয়ী! উহাদের প্রকৃতপক্ষে নীতির কোন ভাবই নাই, তথাপি সংস্কার বশতঃ যেন বুঝিতে পারে যে, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা অতি ভাল ব্যবস্থা, এবং সে জন্য কত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াই সঞ্চয় করে! কুকুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে—উহার কিছুমাত্র নৈতিক প্রকৃতি নাই ; কোন্ কাজ উচিত, কোন্ কাজ অনুচিত কিছুমাত্র বুঝে না। উহাকে নীতিপরায়ণ দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মী (moral agent) বলা যায় না ; তথাপি স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃ উহা যেন বুঝে, যেন উহার জ্ঞান হয় যে, উহাকে উহার প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। কতকগুলি জন্তু আত্মরক্ষার জন্য অথবা বৈরনির্য্যাতনের জন্য দলবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহারা দলবদ্ধ হইলে তাহাদের শক্তি বাড়িবে, এরূপ পরামর্শ করিয়া কখনও দলবদ্ধ হয় না, তাহারা কেবল স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃই এরূপ দলবদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ সকল বিষয়ে সেই সকল জন্তুদিগের প্রকৃতপক্ষে কোন উপযুক্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা নাই, কিম্বা প্রকৃত নীতিজ্ঞানও নাই ; তথাপি কার্য্যকালে তাহারা সংস্কারবশতঃ অনুভব করে, বিশেষ বিশেষ জন্তু বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুভব করে যে, উহাকে ঐ বিশেষভাবেই কার্য্য করিতে হইবে এবং পরিণামে তদ্রূপই কার্য্য করে। সৃষ্টির সর্ব্বত্রই এইরূপ ঘটিতেছে আমরা দেখিতে পাই।

এই প্রকারে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই যে সৃষ্টির মধ্যে পদার্থ সকল ও জীব সকল ক্রমশঃ ক্রমোচ্চ সোপানে অবস্থিত রহিয়াছে, সামান্য ক্ষুদ্র জড় পরমাণু হইতে সর্ব্বোচ্চ জীব পর্য্যন্ত কোথাও এমন কোন সামগ্রী নাই, যাহার কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট গুণ নাই। প্রত্যেক পদার্থেই কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট গুণ সংযোজিত করা আছেই। প্রত্যেকেরই গতি রীতি নির্দ্দিষ্ট পথে চলে এবং যেখানে উন্নতি-লাভের ব্যবস্থা আছে, সেখানে সেই উন্নতি নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া হয়। অবস্থা বিশেষে কিছু কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহাও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যেই ঘটে। ক্রমবিকাশেরও সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, যথেচ্ছ-ভাবে কিছুই সংঘটিত হয় না।

মনুষ্যও এই নিয়মের অধীন, তাহারও বিশেষ বিশেষ গুণ, শক্তি ও ক্ষমতা আছে এবং তাহার জীবনপথের সীমাও নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহারও স্বাভাবিক সংস্কার সকল আছে। অন্য অন্য জীবের সম্বন্ধেও যেরূপ, মনুষ্য সম্বন্ধেও সেই সব সংস্কার তাহার জীবনের ও প্রকৃতির উপযোগী। তাহার প্রকৃতি জগতের অন্য জীবের মত নহে, ইহা স্বাধীন ও প্রকৃতজ্ঞানবিশিষ্ট এবং নৈতিক জগতে এ প্রকার অন্য কোনও জীবের নাই। মনুষ্যের শক্তি ও সংস্কারগুলি এমন বিশিষ্ট প্রকৃতির অনুযায়ী যে, তদ্দ্বারা তাহার উন্নত জ্ঞানশক্তির, দায়িত্বপূর্ণ স্বাধীন কার্য্যকারিত্বের ও তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিকাশের ও ক্রিয়ার যথেষ্ট পূর্ণক্ষেত্র ও অবসর সে প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহা না হইলে তাহার জীবন বৃথা হইয়া যাইত। তাহারও আবার জীবনের যে নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, তাহা সে অতিক্রম করিতে পারে না; তাহারই মধ্যে থাকিয়া তাহার সেই উন্নতজ্ঞানের ও

ন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে সকল শক্তি আছে, তাহাদের কার্য্য ও বিকাশ পূর্ণ হইতে থাকে। মনুষ্য-জীবনের গতি এই প্রকার। মনুষ্যের এই প্রকার বিশিষ্ট শক্তি ও প্রকৃতি আছে বলিয়াই, মনুষ্য জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্‌কে জানিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার জীবনের যে নির্দ্দিষ্ট পথ, তাহার অনুসরণ করিবার জন্য এই ঈশ্বরজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মনুষ্যের বিশিষ্ট শক্তি ও প্রকৃতি অন্য জীবের না থাকায়, তাহারা ঈশ্বরকে জানিবার প্রয়োজন বুঝে না ও তাহাদের জানিবারও অধিকার নাই। স্বাধীনজ্ঞান-পূর্ণ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন না থাকিলে, কোনও জীব ভগবান্‌কে বুঝিতেই পারে না ও তাঁহার বিষয়ও ধারণাই করিতে পারে না। তাহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা বা জ্ঞানই নাই। এক মনুষ্যেরই ইহা আছে। মনুষ্য যে এই জ্ঞান ধারণ করে, ভগবান্ সম্বন্ধে কথা কহে, আলোচনা করে, সে কেবল তাহার এই প্রকৃতি হইতে সম্ভূত। আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই (মনুষ্যও তাহার অন্তর্গত) শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। আবার প্রকৃতি এই সকল ক্ষমতা দিবার বিষয়ে বড়ই মিতব্যয়ী। যেন তেন প্রকারে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, যে স্থানে ও যাহাকে যেমন দেওয়া প্রয়োজন, সেইভাবে দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহাও সেইরূপে দেওয়া হইয়াছে, যাহা অন্য কোন উপায় বা প্রক্রিয়ার দ্বারা জীব তাহা লাভ করিতে পারে না। যে জীবের জীবন যেরূপ, তাহার সেই বিশিষ্ট জীবনের উপযোগী শক্তিই দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ যে শক্তির অভাবে তাহার জীবন-যাপন সম্ভব হয় না, সেই শক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকারে বিভিন্নপ্রকার বহু জীব যে জগতে

আছে, তাহারা সকলে বিভিন্নপ্রকারের শক্তি-সম্পন্ন। ইহা বিধাতার এক বিচিত্র লীলা। এই বিচিত্রতার কারণ ও তাৎপর্য্য নির্ণয় কে করিবে? মনুষ্যের শক্তি পরিমিত, এ পর্য্যন্ত এ তত্ত্বের নির্দ্ধারণ মানুষ করিয়া উঠিতে পারে নাই; পারিবে যে, সে আশাও নাই। আমরা কেবল দর্শকরূপে দেখিতেছি যে, জগতের ব্যবস্থাই এইরূপ এবং এইরূপেই জগৎ চলিতেছে। এবং ইহাও উপলব্ধি করিতে পারি যে, বিভিন্ন জীব তাহাদের বিভিন্নপ্রকার অভাব-পূরণের উপযোগী বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

মধুমক্ষিকার তাহার জীবন ও প্রকৃতির জন্য মধুচক্র-নির্ম্মাণ প্রয়োজন, তাহা নির্ম্মাণ না করিলে তাহার চলেনা, সে জন্য উহা নির্ম্মাণ করিবার উপযুক্ত স্বাভাবিক সংস্কার তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। বীবর জন্তুকে তাহার কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ-নির্ম্মাণের সহায়তার জন্য, তাহার বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী নদীর স্রোত কোন্ দিগ্গামী, তাহা বুঝিবার শক্তি দেওয়া হইয়াছে। শৃঙ্গী মহিষ ও মহিষীগণ তাহাদের স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃ বিলক্ষণ বুঝিতে পারে যে, তাহারা একত্র হইয়া মণ্ডলাকারে অবস্থিতি করিয়া, তাহাদের সুদৃঢ় শৃঙ্গগুলি বহির্দিকে রাখিয়া, মধ্যস্থলে তাহাদের শাবকদিগকে রাখিলে, তাহারা প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইতে পারে। এইরূপে দেখা যায় যে, যে যে জীবের জীবনরক্ষার জন্য যে যে প্রকার শক্তি ও গুণ আবশ্যক, সেই সেই জীবের সেই সেই শক্তি, গুণ ও প্রকৃতি তাহাদের প্রদত্ত হইয়াছে, নিজেরা অন্য কোন উপায় দ্বারা তাহা লাভ করিতে পারে না।

মনুষ্য-সম্বন্ধেও বিধি সেই প্রকারই। তাহার জীবনে অবশ্য বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব থাকায়, তাহার পক্ষে কোন্ জিনিষ একান্ত প্রয়োজনীয়, যাহা না হইলে তাহার বিশিষ্ট জীবন একেবারেই চলে না? এই প্রশ্নের উত্তর :—ঈশ্বরজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান। ভারতের অধিবাসীকে ইহা আর বেশী করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণপণা এইখানেই। তিনি জানেন যে, মানবের সকল অবস্থাতেই এই জ্ঞান বিশেষ সহায়। মানুষের জীবন ইহাতেই সঞ্চালিত হয়, ইহা ব্যতিরেকে জীবন কেবল অসহ্য দুঃখের আগার হয়। যে পৃথিবীতে অপর সকল জীবজন্তু সুখে ও সন্তুষ্টভাবে জীবন যাপন করিয়া থাকে, সেখানে কেবল মানুষই শুধু দুঃখ যন্ত্রণায় এবং নিরানন্দে দিন কাটাইত, যদি তাহার এই জ্ঞান না থাকিত যে, একজন বিধাতা আছেন, যিনি সকলের উপর এবং যিনি সকলের তত্ত্বাবধান করেন ও সকলের মঙ্গলের জন্য বিধি ব্যবস্থা করেন। বিধাতা সকলকেই দেখিতেছেন ও সকলের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। এই পূর্ণ প্রতীতি না থাকিলে, মানুষ কি কখন এই শোকদুঃখপূর্ণ সংসারে শান্তিতে তিষ্ঠিতে পারে বা সুখী হইতে পারে? যে সংসারে চতুর্দ্দিকে সহস্রপ্রকার ঘোর নিরুৎসাহ ও বিভীষিকা জন্মাইবার বিষয় ও অবস্থা সকল বিদ্যমান, সেই সংসারের মধ্যে ঈশ্বরে এই বিশ্বাস ও জ্ঞান না থাকিলে, মানুষ কি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত? যত কিছু মঙ্গলের আশা ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এই বিশ্বাস হইতে সঞ্জাত ও ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত। এই সকল আশা, আকাঙ্ক্ষাই মানবজীবনকে মহত্ত্ব প্রদান করে ও উন্নতিশীল করে এবং মানুষকে সুখী ও স্বর্গের জীব করে। ইহাতেই

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব ও দেবত্ব। ইহার অভাবে মানুষের জীবন অন্যপ্রকার হইয়া যাইত। মানুষ যে মানুষ, তাহা এই ঈশ্বর-জ্ঞানের জন্যই। এই জ্ঞান মানুষের পক্ষে ও তাহার জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এবং প্রয়োজনীয় বলিয়াই মানুষকে এই জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার প্রকৃতি এই জ্ঞানলাভের উপযোগী হইয়াছে এবং ইহা লাভ করিয়াছে।

এই জ্ঞান মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রযোজনীয় বটে, কিন্তু মানুষ কি ইহা তাহার নিকটস্থ ও পারিপার্শ্বিক পদার্থ সকল হইতে লাভ করিতে পারে? ইহা কি সম্ভবপর? এই ঈশ্বরজ্ঞানের মধ্যে পূর্ণতার ও অনন্তের ভাব নিহিত রহিয়াছে; সে ভাব কি চারিদিকের অপূর্ণ সীমাবদ্ধ বিষয় সকল হইতে কোনরূপে উদ্দীপ্ত হইতে পারে? ইহা কি কখন সম্ভব হয়? যাহা নিজে সীমাবদ্ধ, তাহা কেবল সসীমভাবই উৎপন্ন করিতে পারে—ছোট, বড়, প্রকাণ্ড বড় এইরূপ—কিন্তু সীমা নাই, এমন কোন বস্তুর ভাব সে সকল হইতে আসিতে পারে না—অন্তবিশিষ্ট বিষয় হইতে অনন্তের ভাব বা চিন্তা মনে আসিতেই পারে না। দ্বিতীয় কথা, এই যে চারিদিকে পদার্থ সকল, ঘটনা সকল অপ্রতিহতভাবে আপনার আপনার নিয়োজিত পথে চলিয়া যাইতেছে—কাহারও মুখাপেক্ষায় থাকে না; তবে কেন সে সকল হইতে ঈশ্বরের ভাব—একজন আছেন, যাঁহার উপর এই সমুদায় নির্ভর করে—এই ভাব মানবহৃদয়ে উদিত বা অঙ্কিত হইবে? প্রকৃতিরাজ্য আপনার জড়ভাবে অবিশ্রান্ত কাজ করিতেছে; আকাশের জ্যোতিষ্ক সমূহ অবাধে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর, ঋতুর পর ঋতু, ভ্রাম্যমাণ হইয়া ঘুরিতেছে, তাহার বিরাম

নাই; মহাব্যোম এক মণ্ডলাকার দৃষ্টির আবরণের সীমায় বেষ্টিত হইয়া স্থানের সীমা নির্ণয় করিয়া দিতেছে; রাত্রি, দিন, মাস, সম্বৎসর বারবার ফিরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে; জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, ক্ষুদ্র মহান্ সমুদায় জন্মিতেছে, বাঁচিতেছে, মৃত্যুমুখে পড়িতেছে; অবিরাম এইরূপ চতুর্দ্দিকে ঘটিয়া চলিতেছে। ঘটিতেছে, আসিতেছে ও যাইতেছে। ভবের ব্যাপারই এই। ইহারই মধ্যে মানুষ জন্মে, বর্দ্ধিত হয় ও মৃত হয়। এই পথেই সকলে চলিতেছে। ইহা ভেদ করিয়া, আবার আর যে কিছু আছে, যাহা এ সব ঘটাইতেছে, সে চিন্তা কেন মানবমনে আসিবে—এ সকল হইতে সেদিকে চিন্তা কেন যাইবে? এ সকলের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাতে সে চিন্তা উদয় করাইয়া দিতে পারে; তবে সে দিকে চিন্তা কেন যাইবে?

রজনীর অবসানে দিনের আনন্দদায়ক আলোক—দিবাবসানে চন্দ্রের স্নিগ্ধ মনোহর জ্যোৎস্না—শরীর-স্নিগ্ধকারী সুশীতল সমীরণ—দেহের ক্ষুধাতৃষ্ণাদি অভাব-মোচনে আরাম-স্বাস্থ্য-বিশ্রাম-প্রদায়িনী নিদ্রা—এ সমস্তই মানবের অতীব সুখ-সম্ভোগের বস্তু। অন্যান্য জীবের সঙ্গে মানুষ এই সমস্ত সম্ভোগ করে; কিন্তু মানবের মন এ সমস্ত অতিক্রম করিয়া অন্য কিছুর দিকে কেন ধাবিত হয়, যদি তাহার নিজের অন্তরমধ্যে সেরূপ অনুধাবনার কোন সঙ্কেত না থাকে? মন সহজে কিছু সেদিকে যায় না—তবে যাওয়ায় কে? এ সকল আপনা আপনি মনকে সেদিকে লইয়া যায় না—অন্য জীবজন্তুরও এদিকে ভাবনা নাই—মানুষকে তবে এদিকে যাওয়ায় কে? মানুষের মনের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহাই তাহাকে অন্য চিন্তার দিকে লইয়া যায়। মানুষের নিজের

মনের মধ্যে ধারণা নিহিত আছে, সে জন্য সে জানিতে পারে, অনুভব করিতে পারে যে, এই সকল যে ঘটিতেছে, ইহার কারণ আছে। এই কারণের অবস্থিতির অনুভবকারিণী শক্তি মানুষের অন্তরে নিহিত থাকাতেই, সে তাহা খুঁজিয়া পাইবাব জন্য অন্বেষণ করে। এই এক শক্তি তাহার প্রকৃতির ভিতর নিহিত হইয়াছে এবং সেই জন্য মানুষ এই কারণ অনুসন্ধান করে। ইহাতেই সকল প্রকার জ্ঞান, বিজ্ঞান, আলোচনার মূল নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া, মানুষ যেরূপ কার্য্য, যেরূপ ঘটনা, সেইরূপই কারণ খুঁজিবে; কার্য্যের উপযোগী কারণ হইলেই, তাহার মন তুষ্ট হয়। চারিদিকের পদার্থ সমস্তই সীমাবদ্ধ—অন্তবিশিষ্ট; ইহাদের কারণও অন্তবিশিষ্ট হইলেই যথেষ্ট হইল। অনন্ত যে কারণ—এ অনন্তের ভাব—কি জন্য তাহার মনে আসিবে? এ ভাব তখনই উদিত হওয়া সম্ভব, যখন মনুষ্য অনন্তের স্পর্শে আসে, অনন্তের দর্শন হয়। অন্য আর কোনও উপায়ে ইহা উদিত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব মানুষের মনে যে এই অনন্তের ভাব উদিত হইতেছে—এই যে ঈশ্বরজ্ঞান আছে—তাহার কারণ এই যে, মানুষ সেই অনন্ত ঈশ্বরকে দেখে, এবং তাহার এই দেখিবার শক্তি আছে। এ শক্তি অন্য কোন জীব বা পদার্থের নাই, কেবল মাত্র মানুষেরই আছে। ইহা তাহারই নিজ অন্তর্নিহিত শক্তি। ইহা হইতেই মানুষের ঈশ্বরজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহাতে সংশয়ের কোন কারণ নাই।

পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, জগন্ময় সমস্ত পদার্থ ও জীব কোন না কোন বিশিষ্ট গুণ ও শক্তির সহিত সৃজিত, এবং নানাজীবের

নানাপ্রকার সংস্কার আছে। এই যে মানুষের শক্তি উপরে উল্লিখিত হইল, ইহা মানুষের এক বিশিষ্ট শক্তি, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। মধুমক্ষিকা যদি একপ্রকার বিশেষ শক্তিতে মধুচক্র-নির্ম্মাণের সুনিপুণ প্রথার সত্যতা অনুভব করিতে পারে, সেইরূপ মনুষ্যও তাহার এক বিশেষ শক্তি দ্বারা অনন্ত ভগবানের অস্তিত্বের সত্যতা অনুভব করে। আলোক বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও অন্ধজন চক্ষুঃশক্তি অভাবে তাহা অনুভব করিতে পারে না—এক চক্ষুঃশক্তিই আলোকের অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়। নিকৃষ্ট জীবেরা উপযুক্ত শক্তির অভাবে, ঈশ্বর আছেন, ইহা জানিতে পারে না; মানুষের উপযুক্ত শক্তি থাকায়, মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে ও তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে। মানুষের এই শক্তি তাহার বিশিষ্ট প্রকৃতির অনুযায়ীই। মানুষের ন্যায় অন্য জীবেরা স্বাধীন নহে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন নহে; কাজেই তাহাদের শক্তির সহিত মানুষের শক্তির বিভিন্নতা হইবেই। তাহাদের সংস্কারগুলিই তাহাদের মধ্যে প্রবলরূপে কার্য্য করে, কোনপ্রকার স্বাধীনতা-প্রয়োগের পথ তাহাতে থাকে না। মধুমক্ষিকা চিরকালই একভাবে তাহার মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে, সেইভাবে করা ভিন্ন তাহার অন্য গতি নাই, কিম্বা কোন স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের শক্তি নাই। অন্যান্য জীব জন্তু তদ্রূপ তাহাদের নিজ নিজ কার্য্য তাহাদের সংস্কারানুযায়ী একই ভাবে চিরকাল সম্পন্ন করিয়া আসি-তেছে। যদি মানুষের ঈশ্বরজ্ঞান-বিষয়ক শক্তি ঠিক অন্যান্য জীবের সংস্কারের মত হইত, মানুষের স্বাধীনতার স্থল না থাকিত, কিম্বা তাহার স্বাধীন প্রবৃত্তির থর্ব্বতা হইত, তাহা হইলে মানুষের নৈতিক

ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতিও নষ্ট হইয়া যাইত। মানুষকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সেই এক নির্দ্দিষ্ট পথেই অনন্যগতি হইয়া ঘুরিতে হইত।

দেখা যাইতেছে যে, অন্যান্য জীবের সংস্কার (instinct) সকল যেরূপ, মানুষের শক্তি বা সংস্কার সেরূপ নহে। ইহা বিভিন্ন প্রকারের এবং মানুষের প্রকৃতিরই উপযোগী। এই শক্তি হইতেই মানুষ ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বর-দর্শন লাভ করিতে সমর্থ। কিন্তু এই শক্তি মাত্রই তাহাকে ঐ দর্শন পরিষ্কারভাবে পাইতে সমর্থ করে না, একপ্রকার আলোছায়ার মত অপরিস্ফুট আভাস মাত্র দেখিতে দেয় মাত্র। সেজন্য ইহা ঠিক জীবদের সংস্কারের (instinct) মত জিনিষ নহে, ইহা অন্য নামে আখ্যাত—ইহাকে বলে একপ্রকার সহজ জ্ঞান (intuition)। কিন্তু ইহা পূর্ণ জ্ঞান নহে, ইহা জ্ঞানের অপরিস্ফুট অঙ্কুর মাত্র—ইহাকে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের মতন কিছু বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা ঠিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মত পরিষ্কার নহে; ইহাকে ভাবের মতন কিছু বলা যাইতে পারে, কিন্তু স্পষ্ট অনুভূত জলন্তভাব নহে। এইরূপে ইহা এক বিশেষ প্রকারের জ্ঞানোন্মেষ। এই আভাস মানুষ নিশ্চিতই পায়, ইহা অনিবার্য্য; কিন্তু ইহার উপর তাহার স্বাধীন শক্তিও কার্য্য করিবার অবসর পায়, যাহা অন্য জীব জন্তুদের পক্ষে সম্ভব নহে। এই আভাস মানুষ না পাইলে, মানুষ এ সত্য (ঈশ্বরজ্ঞান) জানিতে পারিত না, অথচ এই সত্য বিশেষরূপে তাহার জীবনের পক্ষে এতই প্রয়োজনীয় যে, ইহা ব্যতীত তাহার জীবন প্রকৃতভাবে যাপন করা অসম্ভব হইত। এই জন্য এই বিশেষ কৌশল দ্বারা তাহাকে এই সত্য জানিবার পথে অগ্রসর করা হইয়াছে, যাহাতে তাহার সেই নিতান্ত প্রয়োজনীয়

অভাবও মোচন হইয়াছে এবং তাহার স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তিরও পথ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত হইয়াছে। এই আভাসও অনুভব করিবে, অথচ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপনার মনের শক্তির সীমানুযায়ী ইহার আকার ইঙ্গিত বুঝিয়া লইতে থাকিবে; নিজে যে পরিমাণে উন্নত হইবে, সেই অনুসারে উত্তরোত্তর অধিকতর বুঝিতে থাকিবে।

কিন্তু এখানে একটী বিশেষ বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। সেটী এই যে, স্বাধীনভাবে ঐ আভাসকে আকার প্রকার দিতে গিয়া, মানুষ আসল সত্যকে একেবারে হারাইয়া ফেলিতে পারে, এবং এ আভাস পাইবার যে প্রকৃত তাৎপর্য্য, যে বিশেষ উপকারিতা, তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ও বিফল এবং অপ্রাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে। এই বিফলতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষের মনে এক অনিবার্য্য আকাঙ্ক্ষা রোপিত হইয়াছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঠিক সেই আভাসের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহার দৃষ্টি হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। ক্রমাগতই তাহার চেষ্টা হইতে থাকে, কিসে সে সেই-রূপ ভাবে ঐ সত্য উপলব্ধি করিবে। মানুষের ইতিহাসে জগতে যত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা কেবল এই চেষ্টারই পরিচয় মাত্র। যত বিভিন্নপ্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে—যত অগণ্য ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভাব ও ধারণা—ধর্ম্ম-সাধনের যত অসংখ্য উপায় ও প্রথা—সমস্তই ইহা হইতে উদ্ভূত। সেই আভাস যে সত্য-প্রকাশের জন্য, সেই সত্য উপলব্ধি করিবার এ সকল বিভিন্নপ্রকার চেষ্টা মাত্র। সে সত্য তো অনন্ত, অসীম, পরিপূর্ণ, সুতরাং এ চেষ্টার কখন বিরাম হইবার সম্ভাবনা নাই—প্রত্যেক ব্যক্তিরই এ চেষ্টা ইহকাল পরকাল অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে, এবং মনুষ্য-সমাজও চিরকাল

ইহারই পশ্চাতে ধাবিত হইবে এবং উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতিও উপলব্ধি করিতে থাকিবে। মানবের ধর্ম্মের ইতিহাস যতই কেন বিষম বিবাদ বিসম্বাদ, বিদ্বেষ ও রক্তপাতের কাহিনীতে পূর্ণ হউক না, ইহা শূন্যগর্ভ নহে; কিন্তু তাহার পূর্ণতা ও উন্নতির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসরের বৃত্তান্ত। এইরূপে মনুষ্য ক্রমাগত পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ভগবানের কৃপায় এখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে যে, এমন স্থানে জগৎ পঁহুছিবে, যেখানে একতা ও প্রেম সত্যই বিরাজ করিবে; এবং সেই মিলনের ভূমি হইবে, যেখানে সকলে সদ্ভাবে স্বর্গীয় জীবনলাভের ও ঈশ্বরদর্শনের দিকে যাত্রা করিবে এবং উত্তরোত্তর পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে।

মনুষ্যের মধ্যেই কেবল এই অনিবার্য্য পূর্ণতালাভের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। নিকৃষ্ট জীবদের মধ্যে ইহা নাই এবং তাহাদের ইহার প্রয়োজনীয়তাও নাই। তাহাদের যে আকাঙ্ক্ষাদি আছে, তাহা অন্য প্রকারের। যেমন তৃষ্ণা-নিবারণার্থ জলের আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য আহারের আকাঙ্ক্ষা, রৌদ্র-নিবারণের জন্য শীতল ছায়ার আকাঙ্ক্ষা, শীত-নিবারণের জন্য উত্তাপের আকাঙ্ক্ষা, সেইরূপ দলবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, আরামের জন্য শরীর-সঞ্চালনের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু অন্য প্রকারের, তাহার গভীরতার মাত্রা অত্যধিক। শারীরিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়া উহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক্ আছে। যাহা কিছু শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলপ্রদ, সে সমস্তই মানুষ পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে ও সেজন্য চেষ্টা করে, ও তাহা নিজ জীবনে

আত্মস্থ করিতে চাহে। যতক্ষণ না তাহাতে কৃতকার্য্য হয়, ততক্ষণ তাহার প্রাণে প্রকৃত শান্তি আইসে না।

ঈশ্বরদর্শনের যে আভাসমাত্র মানুষ প্রথমে পায়, তাহা দ্বারা সে তাঁহাকে পূর্ণ সত্য শিবসুন্দররূপে অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে। তাহা পূর্ণভাবে ও ভাল করিয়া অনুভব করিবার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা হয়। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার পথে অগ্রসর হইয়া সে দেখে যে, সে পথে অগ্রসর হইতে হইলে নিজেকে ভাল করিতে হইবে, নিজের মধ্যে যে সকল ত্রুটি আছে, তাহা পরিহার করিতে হইবে। তখন তাহার সেই সকল ত্রুটি দুর করিবার চেষ্টা হয় ও ক্রমে তাহার উন্নতি হয় এবং সেই আভাসদৃষ্টি ক্রমে পরিষ্কার হইয়া ঈশ্বরকে আরও পূর্ণভাবে দেখায়। এই আকাঙ্ক্ষা মনুষ্যজীবনের উন্নতিলাভের প্রবর্ত্তক ও উপায় হয়। মনুষ্যের যত কিছু উন্নতি—জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শাস্ত্রে, ধর্ম্মে, শিল্পে, সভ্যতায় ও অন্যান্য সকল বিষয়ে, তাহার মূলে এই আকাঙ্ক্ষারই তাড়না। এই আকাঙ্ক্ষা যতই পূরণ হইতে থাকে এবং মানুষ যে পরিমাণে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, সেই পরিমাণে তাহার ঈশ্বরদর্শনের আভাস ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। এইরূপে মানুষ কখনই তাঁহাকে দেখিতে বঞ্চিত থাকিবে না, যাঁহাকে সেই সামান্য সহজ-জ্ঞান মানুষের নিকট সামান্য আভাসরূপে প্রকাশিত করে। মানুষের শক্তি সকল ও বল, সকল প্রকারের উন্নতি এই দর্শনে চিরদিন তাহার সহায়তা করিয়া আসিতেছে ও চিরদিন করিতে থাকিবে।

সহজজ্ঞান

সহজজ্ঞানের বিষয় এখানে কিছু আলোচনা করা যাউক। ইহার প্রকৃতি ও ইহা আমাদের জীবনে কিরূপ কার্য্য করে, দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত পক্ষে ইহার 'জ্ঞান' আখ্যা দেওয়া যায় না। জ্ঞান আখ্যা দিলেও, ইহাকে ঠিক জ্ঞান বলিয়া যেন মনে না করা হয়। "সহজজ্ঞান" ও ঠিক জ্ঞান এক পদার্থ নহে। জ্ঞানের সঙ্গে কিছু না কিছু বুদ্ধি-বিচারের সংমিশ্রণ থাকে, সহজজ্ঞানে সে প্রকার কোন সংমিশ্রণ নাই। ইহা স্বাভাবিক বিশ্বাস, স্বতঃ উৎপন্ন বিশ্বাসের মত। কেহ কেহ ইহাকে আত্ম-প্রত্যয়ও বলেন। ইহা মনের সহজ স্বাভাবিক অপরিহার্য্য ব্যবস্থা-শক্তি।

শরীর সম্বন্ধে দেখা যায় যে, ইহার সমুদায় কার্য্য এক এক বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সংসাধিত হয়। কার্য্য করিবার জন্য হস্ত, বেড়াইবার জন্য পদ, দেখিবার জন্য চক্ষু, খাদ্যপাকের জন্য পাকস্থলী, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য ফুস্‌ফুস্, রক্ত প্রস্তুত ও সঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড, স্নায়ুর কার্য্যের জন্য মস্তিষ্ক ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বিশেষ বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য গঠিত। মন সম্বন্ধে ব্যবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। মন একই পদার্থ, ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই; যত কিছু মানসিক শক্তি আছে, তাহা সব একই সেই মনেতে নিহিত আছে। কোন এক মানসিক শক্তির চালনার জন্য, বিশেষ কোন শারীরিক অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু মনের মধ্যে কোন প্রকার অংশ বা অঙ্গ নাই,

মন একই বিশেষ পদার্থ। ইহা আত্মিক। ইহার শক্তি সকল ইহাতেই অবস্থিত। উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইলে, সেই সকল শক্তি আপন আপন কার্য্য করে—প্রকাশিত হয়। মনের এইরূপ বিধি। মানুষের এই যে সহজজ্ঞান আছে, তাহা প্রকাশ পায় তখন, যখন সেই প্রকারের উপযোগী অবস্থা সংঘটিত হয়। সেই সংঘটন না হইলে, সে শক্তি যে মনের মধ্যে আছে, তাহা বুঝা যায় না। প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ সংঘটনে বিশেষ বিশেষ প্রকাশ হয়। সুতরাং প্রত্যেক প্রকাশই বিশেষ বিশেষ ভাববিশিষ্ট। এ প্রকাশ সাধারণভাববিশিষ্ট (general) হইতে পারে না। বিজ্ঞানশাস্ত্র কেবল এই বিশেষ বিশেষ ঘটনা লক্ষ্য করিয়া, সাধারণরূপে সেই শক্তিকে ব্যক্ত করেন ও আলোচনা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কার্য্য-কারণ-জ্ঞান-বিষয়ক সহজজ্ঞানরূপ শক্তিকে লইতে পারি। এই শক্তি যেন একটী চক্ষুস্বরূপ। ইহার দ্বারা মন দেখিতে পায় যে, যখন একটী ঘটনা ঘটিল, সেটী অমুক অমুক কারণ হইতে ঘটিল—যখন কারণটী সংঘটিত কার্য্যের উপযুক্ত বোধ হইল, তখন মন তুষ্ট হইল, নতুবা মনে যেন একটা অভাব রহিয়া গেল, এ ঘটনা কি কারণে হইল, ঠিক বুঝিল না। এইরূপে এক একটী ঘটনা দেখে, আর মনে হয়, ইহা অমুক অমুক কারণ হইতে সমুৎপন্ন। বাহিরে একটী ঘটনা, তাহার পর আর একটী ঘটনা অবস্থিত থাকে ; এই একের পর আর এক. এই ক্রমপরম্পরামাত্র বাহিরে দেখা যায়, আর কিছু দেখা যায় না। কিন্তু একটী আর একটীর কারণ, আর পরবর্ত্তী পূর্ব্ববর্ত্তীর কার্য্য, ইহা মনই বুঝে—মনের যেন চক্ষু আছে যে, সে সেই চক্ষুর দ্বারায় সে ক্রমভেদ-কারণ বুঝিতে পারে যে, পূর্ব্বটীর

ভিতরে এমন কিছু শক্তি আছে, যাহা হইতে এই পরবর্ত্তীটী সমুৎপন্ন হইল। এই সম্বন্ধটী মন দেখে, কিন্তু মনের মধ্যে এমন কোন সাধারণ নিয়ম লেখা নাই যে, সকল কার্য্যের কারণ আছে। মন বিশেষ বিশেষ কার্য্য দেখে, আর বুঝে যে, ইহার উপযুক্ত কারণ আছে এই। মনের এই বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া দেখিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র নির্দ্ধারণ করেন যে, মন কার্য্যের কারণ বুঝে এবং প্রত্যেক কার্য্য ও ঘটনা যাহা ঘটে, তাহা উপযুক্ত কারণ হইতেই হয়, আর মনের এই বুঝিবার শক্তি আছে। এই যে সাধারণভাবে এ বিষয়টীর বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা, এ নিয়মরূপে সংস্থাপিত করা যে প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে, ইহা বিজ্ঞানের কার্য্য; মন দেখে কেবল বিশেষ বিশেষ ভাবে। যখনই বিশেষ কোন জিনিষ দেখে, অমনি মন বুঝে যে, অমুক অমুক কারণ হইতে ইহা উৎপন্ন হইল—হয়ত সে ভুল করে, ঠিক কারণটী নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভুল হয়, কিন্তু ক্রমে বুদ্ধি-বিচার দ্বারা সে কারণটী ঠিক ধরিতে পারে। কোন কারণ, উপযুক্ত কারণ হইতে ও তাহার ভিতরে যে শক্তি আছে, তাহা হইতে যে এ কার্যটী উৎপন্ন হইল, ইহা মন বুঝিতে পারে। ভ্রম হইলে এইই শক্তি, বুদ্ধিবিচার ও অন্যান্য শক্তির সহায়তায় সে ভ্রম ধরিয়া ফেলিতে পারে ও সংশোধন করিতে পারে। এই যে ভাব, যে কার্য্যের কারণ আছেই আছে, এই অনুভূতি মনের শক্তি, ইহার সহজজ্ঞান। ইহা মনে সাধারণভাবে নাই, কিন্তু প্রত্যেক বিশেষ কার্য্য দেখিলেই এই ভাব উৎপন্ন হয়, এই শক্তির প্রকাশ হয়।

এই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধীয় সহজজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া, সহজজ্ঞান বিষয়ে আরও কথা বলা যাইতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত মনে

করেন যে, সহজজ্ঞান বলিয়া কোন শক্তি নাই। তাঁহারা বলেন যে, এইরূপ সব ধারণা চারিদিকের পদার্থ ও ঘটনা সমুদায় দেখিতে দেখিতে মানুষের মনে উৎপন্ন হয়। এ সকল ধারণা কেবল চারিদিকের বিষয় সকল দেখা শুনার ফলে একটী সিদ্ধান্ত মাত্র, তাহা ছাড়া আর কিছু নহে; কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে, একথা ঠিক হইতে পারে না। চারিদিকের পদার্থে আমরা কি দেখিতে পাই? যাহা বাহ্যতঃ, তাহাই ত দেখি—তাহাতে ত কার্য্যকারণরূপে কিছু দেখি না; দেখি একটার পর একটা ঘটনা, এই ক্রমাগত দেখি—ইহাতে ত কার্য্যকারণ কিছু নাই—কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বলিলে বুঝায় যে, একটার মধ্যে এমন কিছু শক্তি আছে, যাহার দ্বারায় অন্যটাকে সংঘটিত করে। সে শক্তি কি, তাহার কার্য্য বাহিরে কিছু দেখা যায় না, তাহা অন্তর্নিহিত—মনশ্চক্ষুই, মনের এই দেখিবার শক্তিই তাহা দেখে। বাহিরের ঘটনাবলীর সংঘটন হইতে এ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে কোন কারণ অনুভূত হইতে পারে না। ইহা অনুভূত হয় এই জন্য যে, সহজজ্ঞানে মন এইটী ধরিতে পারে—মনের এই শক্তি, যেন এই চক্ষু আছে বলিয়া মন দেখিতে পায়, বুঝিতে পারে। যাহা বাহ্যিক ক্রম, তাহা কেবল ক্রমমাত্র, তাহাতে শক্তির জ্ঞান—শক্তি কার্য্য করিতেছে এ জ্ঞান -কেন আসিবে? এ জ্ঞান এ জন্য জানা যায়, মনের বিশেষ শক্তি, দৃষ্টি আছে বলিয়া—সেই শক্তিই, সেই দৃষ্টিই এই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধীয় সহজজ্ঞান। মনেব এ শক্তি না থাকিলে, মন কারণ অনুসন্ধান করিত না; পশুরা যেমন—পদার্থ সকল, ঘটনা সকল একের পর এক হইয়া যাইতেছে—সেইরূপ দেখিত। তাহার এ ভাব মোটেই মনে উদয় হইত না যে, একটা

আর একটীর কারণ—এবং সে জন্য কারণ অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছাও হইত না। সুতরাং কোন প্রকার জ্ঞানালোচনা, বিজ্ঞান-শাস্ত্র, শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা ইত্যাদি কিছুই জগতে হইত না। মানুষ ইতর পশুর মতনই নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকিয়া যাইত, তাহার কোন প্রকার উন্নতিই হইত না। এই যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের অনুভূতি, ইহা মনুষ্য-প্রকৃতির একটী অত্যাবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয় বস্তু, এবং সেই জন্যই মনুষ্যকে এই সহজজ্ঞান-শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, সত্য পদার্থ ও ঘটনাবলী কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে জ্ঞান মানুষ আভ্যন্তরিক কার্য্য দেখিয়া লাভ করে, ইহা সহজজ্ঞান নহে। তাঁহারা বলেন যে, মানুষ আপনার কার্য্যে দেখে যে, সে আপনি সে কাজের কর্ত্তা, সে নিজেই কার্য্য সংঘটন করায়, আর সংঘটন করাইলে সে কাজ ঘটিয়া থাকে। এই দেখিয়া যখন বাহিরের বিষয় সকল দেখে, তখন তাহার মনে ধারণা হয় যে, বাহিরে যেটী ক্রম অনুসারে পরে ঘটিল, সেটী তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয় দ্বারা ঘটিত, অর্থাৎ সেই পূর্ব্ববর্ত্তীটী পরবর্ত্তী ঘটনার কারণ। কিন্তু ইহাতে প্রকৃত তাৎপর্য্য বর্ণনা করা হইল না।

এই যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ, তাহা মানুষ অনুমান করিবে কেন, মন তাহা না দেখাইলে? নিজের ভিতরে দেখিল বেশ, কিন্তু এইরূপ যে একটা সম্বন্ধ থাকে—আছে—তাহা বুঝিবে কেন? ইহা হইতে পারে যে, সে প্রথম নিজের ভিতরে ইহা অনুভব করিল, তাহার পর বাহিরের পদার্থ সকলের মধ্যে অনুভব করিল। কিন্তু

আপনার ভিতরেই বা প্রথম অনুভব উঠে কেন? ফলতঃ এই কার্য্যকারণরূপ সম্বন্ধটার বিষয় মানুষের মনে একটা ধারণা আছে—সে বুঝে যে, একটা হইতে আর একটা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ তাহার শক্তি কার্য্য করে—এবং এই জন্যই নিজের ভিতরে নিজের শক্তি হইতে কার্য্য হইল, বুঝিতে পারে। অতএব এই ধারণা রহিয়াছে বলিয়াই, সে ভিতরে বুঝিতে পারিল; ইহা না থাকিলে সে নিজের ভিতরেও বুঝিতে পারিত না। সুতরাং প্রথমে আপনার নিজের ভিতরের কার্য্যেতেই বুঝুক, অথবা বাহিরের বিষয় হইতেই বুঝুক, এ ধারণা অন্তর্নিহিত থাকা চাই, তবে সে বোধ আসিবে। তাহার সেই সহজজ্ঞান আছে বলিয়াই, এই বোধের কার্য্য হয়; নিজের ভিতরেই হউক বা বাহিরেই হউক, যেখানেই হউক—ইহা না থাকিলে, এ বোধ কোন ক্রমেই হইত না।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধীয় সহজজ্ঞান বিষয়ে উপরে যে সব কথা বলা হইল, সে সব কথা মানুষের অন্যান্য বিষয়ে সহজজ্ঞান-সম্বন্ধেও সম্পূর্ণরূপে খাটে, বিশেষতঃ ঈশ্বর-জ্ঞান-সম্বন্ধে বিশেষরূপেই খাটে। মনুষ্যজীবনে ইহা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং মনুষ্যজীবনের প্রত্যেক কাজের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহা কার্য্য-কারণ-জ্ঞান অপেক্ষাও আবশ্যক শক্তি। অথচ ইহা অন্য কোন উপায়ে মানুষ লাভ করিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমস্ত সীমা-বিশিষ্ট পদার্থ কোনরূপেই অসীমতার ও পূর্ণতার ভাবের বিন্দুমাত্র আভাস দিতে সক্ষম হইতে পারে না; এ ভাব কেবলমাত্র অসীম পূর্ণ পদার্থকে দেখিলেই আসিতে পারে, অন্যরূপে নহে। অতএব কেহ যদি বলেন যে, মনুষ্য-সমাজের উপকারিত্ব বুঝিয়া আদিতে

মানুষ অনন্ত ঈশ্বর বিষয়ে এক কল্পনা স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহাই বংশ-পরম্পরায় মানুষের মধ্যে প্রচলিত থাকিয়া বর্ত্তমানের ঈশ্বর-জ্ঞানকে উৎপন্ন করিয়াছে, সে মত বিশুদ্ধ যুক্তি ও ন্যায়-বিচারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইবে। প্রথমতঃ, দেখা যাউক, মনুষ্যজাতির আদিম অবস্থাতে, মানুষ কি এতই বিচক্ষণ ছিল যে, সে এই এক কল্পনার এমন উপকারিত্ব বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার সে সময়ের বর্ব্বরতা ও অজ্ঞানতা স্মরণ করিলে, ইহা একান্তই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, চারিদিকে একান্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ অবস্থা ও পদার্থদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, (হইতে পারে কোনটা বড়, সমষ্টিতে কোনটা ছোট, তথাপি সবই সীমার মধ্যে) মনুষ্যের ক্ষুদ্র মন ও চিন্তা কিরূপে সীমা অতিক্রম করিয়া, অসীমের ধারণা করিবে, কল্পনা করিবে, যদি তাহার নিজের ভিতর আদৌ অসীমের দৃষ্টি ও ভাব না থাকে এবং সে ভাব চারিদিকের অবস্থা দ্বারা প্রস্ফুটিত হইয়া না উঠে। কার্য্যকারণ জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা দেখিলাম যে, মানুষের অন্তরে সে জ্ঞানের ধারণা মূলতঃ থাকাতেই, বাহিরের ঘটনার ক্রমদর্শন উহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। সেইরূপ মানুষের অন্তরে অনন্ত পূর্ণ ঈশ্বরের আভাস আছে বলিয়াই, আকাশের বিশাল বিস্তৃতি, মহাসাগরের প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি, কালের অব্যাহত গতি সেই অনন্তের ভাবকে উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। এই যে ভাব, ইহাই সহজজ্ঞান। ইহা অন্তরে আদৌ না থাকিলে, মানুষ কখনই এরূপ কল্পনা করিতে বা ভাবিতে সমর্থ হইত না। সেইরূপ আবার অনেক লোক, যাঁহারা হয়ত সমধিক ভক্ত ও বিশ্বাসী, এরূপ মনে করেন যে, যে সকল সম্প্রদায়ে বা

ধর্ম্মে তাঁহাদের জীবন সংগঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের এই ঈশ্বরজ্ঞান সেই সেই ধর্ম্ম ও তাহার শাস্ত্র হইতেই প্রথমে তাঁহাদের অন্তরে উদিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সাক্ষাদ্‌রূপে (direct) ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে এবং ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে হইবে ও মানিতে হইবে, ইহাই ইহার শিক্ষা, এই জন্য তাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ও তাঁহাকে মানেন। এইরূপ মনে করিলে তাহার ফল এই হয় যে, সেই ধর্ম্ম ও শাস্ত্র অগ্রগামী এবং ঈশ্বর-জ্ঞান তাহা হইতে পরে উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ পশ্চাদ্‌গামী; কিন্তু সে ধর্ম্ম ও শাস্ত্র গ্রহণ করিবার কারণই এই যে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা নির্ম্মিত ও প্রেরিত। সুতরাং ঈশ্বরকে আগে না জানিলে বা না বুঝিলে বা না মানিলে, সে ধর্ম্ম ও শাস্ত্র মানার কারণই থাকে না। অতএব যাঁহারা সেই শাস্ত্র হইতে আদিতে ঈশ্বরজ্ঞান-লাভের উল্লেখ করেন, তাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মে হয়ত মোহিত হইয়া এরূপ বলেন; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাঁহাদের ঈশ্বরজ্ঞান এ ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। এই জ্ঞান সহজজ্ঞান-লব্ধ ও অন্তরস্থিত। একটু বিশেষ ভাবে চিন্তা ও বিবেচনা করিলেই দেখা যায়, সকল সহজজ্ঞানই আদিতে অন্তর হইতে উদ্ভূত। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এ সকল সহজজ্ঞান সাধারণরূপে বিবৃত কোন জ্ঞানাকারে প্রকাশ পায় না; কিন্তু বিশেষ বিশেষ উপযুক্ত ঘটনা অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। সেই সেই ঘটনা যদি উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে ঐ জ্ঞান আছে কি না, কিছুই বোঝা যায়না; কিন্তু যখন ঐ প্রকার কোন ঘটনা ঘটে, তখন তাহার ভিতর দিয়া ইহার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের অবস্থা কিন্তু এমন যে, ঐরূপ ঘটনা ঘটে

এবং সে জ্ঞান প্রকাশ পায়। তবে ঐরূপ ঘটনার উপর নির্ভর করে বলিয়া, ঐ জ্ঞান ঐ ঘটনার রংএ যেন রঞ্জিত হয়। যেমন কোন গাছের বীজ জীবনীশক্তি ধারণ করে বটে, কিন্তু অঙ্কুরিত হইবার সময় মাটীর ও আবহাওয়ার গুণে তাহার অঙ্কুর সতেজ হয়, বা বিশুষ্ক হয় ইত্যাদি। তদ্রূপ সেই সহজজ্ঞান সেই ঘটনার সঙ্গে মিলিত হইয়া, তাহার আকার প্রকার প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, যদিও কার্য্যকারণজ্ঞান সর্ব্বত্র সহজজ্ঞানলব্ধ, তথাপি ভারতের পণ্ডিতেরা জড়ের উৎপত্তি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, (মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ) হইতে উল্লেখ করেন; কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র পরমাণু হইতে বলেন। সুতরাং এইরূপ সহজজ্ঞানের উদ্দীপন পক্ষে, সেই সমুদয় প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়, ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখা আবশ্যক। এইরূপে যদিও সহজজ্ঞান মূলতঃ এক, কিন্তু ইহার রূপ ও প্রকাশ এই সকল ঘটনা ও অবস্থার রংএ রঞ্জিত হয় এবং সেজন্য যদিও সামগ্রী মূলতঃ একই, তথাপি সে একতা আমরা হঠাৎ সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই সকল ঘটনার উপর মানুষ হস্তক্ষেপ করিতে পারে, রদবদল করিতে পারে, এবং ফলিত সহজজ্ঞানকে সে কারণে সহজে বিভিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারে; কিন্তু প্রকৃত ভাবে উপলব্ধি করিলে, মূলতঃ যে একই, তাহা প্রকাশ পায়।

সহজজ্ঞানের প্রকৃত প্রকার বুঝিতে গেলে, মানুষের প্রকৃত অবস্থা বোঝা আবশ্যক। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জন্তুদের বিভিন্ন শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলি কিরূপ, তাহা বিবেচনা করিলেই, মানুষের

অবস্থা অনেকটা বোঝা যায়। মানুষের যে পাঁচ কি ছয় ইন্দ্রিয় আছে, তদ্দ্বারা সে বাহিরের বস্তু সকলের গুণাগুণ জ্ঞাত হয়। চক্ষু দ্বারা আলোক ও বর্ণ পরিজ্ঞাত হয়, কর্ণের দ্বারা শব্দ এবং সেইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্যান্য বিষয় জ্ঞাত হয়। কিন্তু এমন সব জীবও আছে, যাহাদের এ সব ইন্দ্রিয় নাই। তাহাদের যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে, তাহাদের উপযুক্ত জ্ঞানই তাহারা লাভ করে। যে সব ইন্দ্রিয় তাহাদের নাই, সে সব ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় জ্ঞান তাহাদের লাভের উপায় নাই ও সে সব জ্ঞান তাহাদের চিরদিন অজ্ঞাত থাকে। তাহাদের নিকট সেরূপ জ্ঞান বা জ্ঞানের বিষয় যে জগতে বর্ত্তমান আছে, ইহা একেবারেই তাহাদের মনে আসিতে পারে না—সে জ্ঞান-সম্বন্ধে তাহাদের কোন প্রকার ধারণাই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি আজন্ম অন্ধ, যাহার একেবারে চক্ষু নাই, আলোক ও বর্ণ কি, সে তাহা জানে না ; সেইরূপ আজন্ম যে বধির, তাহার পক্ষে শব্দ-সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব থাকিবেই। অথচ আলোক ও শব্দ জগতে চিরদিনই আছে। অন্ধ ও বধিরের নিকট না তাহাদের অস্তিত্ব, না তাহাদের সম্বন্ধে কোন ভাব প্রকাশ পায়, বা এবিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান থাকে বা জন্মে। আমরা অবশ্য বুঝিতে পারি যে, জগতে এমন অনেক বিষয় (ভৌতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি) আছে, কিম্বা থাকিতে পারে, যাহা জানিবার কিম্বা বুঝিবার উপযুক্ত শক্তি আমাদের নাই এবং সে জন্য আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই জানিনা ও জানিতে পারিনা। এরূপ বিষয় যে কত আছে, তাহার নির্দ্দেশ, সংখ্যা ও সীমা কে করিবে এবং কে বলিবে? এই সকল বিষয়ের সব উপযুক্ত সত্য জানিবার পক্ষে এক সহজজ্ঞানই

শক্তিস্বরূপ। ইহার দ্বারায় সেই সেই সত্যটীর যেন এক এক প্রকার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সেই সেই সত্য জগতে অবস্থিত রহিয়াছেই, কিন্তু এই সহজজ্ঞান শক্তিটী না হইলে, মানুষ উহার সম্বন্ধে কিছুই অবগত হইতে পারিত না। এখন বর্ত্তমানে মানুষ যে পারে, তাহার কারণ এই যে, এই সহজজ্ঞান শক্তিটী তাহার আছে ও তাহার দ্বারাই সে বিষয়ের সে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ এক প্রকার আভাস লাভ করে; তাহাতেই সে বিষয় সে জানিতে ও বুঝিতে পারে, সে বিষয় তাহার জ্ঞানগোচর ও প্রত্যক্ষীভূত হয়। ইহা ঠিক সেইরূপ, যেরূপ নিকৃষ্ট জীবের সংস্কার; সেই সংস্কারবশতঃই সে জীব জগতের এক বিশেষ অবস্থিত সত্যকে জানিতে পারে এবং যাহা না থাকিলে সে তাহার কিছুই জানিত না। মানুষ কিম্বা অপর জীব, তাহাদের তাহা জানিবার শক্তি অর্থাৎ সহজজ্ঞান কিম্বা সংস্কার আছে বলিয়াই সেই সত্যের প্রত্যক্ষভাব কিম্বা আভাস জানিতে পারে। ফলতঃ এই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, সেই সহজজ্ঞানই সেই সত্যের প্রমাণ ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষভাবে সেইটীকে উপলব্ধি করাইতেছে। এ বিষয়ের সত্যতা সেই সহজজ্ঞানের নিকট স্বতঃ প্রতিভাত হইতেছে। অর্থাৎ সে সহজজ্ঞান-লব্ধ সত্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ইহার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন থাকিতেছে না। মানুষ এইরূপে ও এইভাবে ইহাকে প্রবলভাবে গ্রহণ করে, বিশ্বাস করে এবং সেইভাবে কার্য্য করে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রবলতর বিশ্বাসের হেতু কিছু হইতে পারে না।

যতদূর নিগূঢ় প্রমাণ মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব, তাহা সহজজ্ঞান

হইতেই পাওয়া যায়। ইহাই প্রাপ্য সত্যকে একেবারে মানুষের সম্মুখে আনিয়া দেখাইয়া দেয়। যে সত্যটীকে ইহা প্রকাশ করে, সেই সত্যটীকে একেবারে তাহার সম্মুখে লইয়া স্থাপিত করে। ইহাই ইহার প্রমাণ। অন্য অন্য প্রমাণ অপ্রত্যক্ষ, আপেক্ষিক ও সে সব অবান্তর বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সে সব প্রমাণ দুই শ্রেণীর হইতে পারে। প্রথমতঃ—নিজবিচারের সিদ্ধান্ত, দ্বিতীয়তঃ—অন্য লোকের সাক্ষ্য। নিজ সিদ্ধান্ত নিজ দর্শন ও সে দর্শনের উপর স্থাপিত বিচারসম্ভূত। দর্শন খুব শুদ্ধ ও সম্যক্ হওয়া আবশ্যক এবং বিচারও তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এ সকলই সহজে ভ্রমসংকুল হওয়া সম্ভব। অন্যের দর্শন ও সাক্ষ্যও সেইরূপ ভ্রমাত্মক হওয়া সম্ভব। অতএব এ সকল প্রমাণ তাদৃশ সন্তোষজনক হইতে পারে না; কিন্তু সহজজ্ঞানের প্রমাণ এ সমস্ত অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়বস্তু জানিতে হয়; অর্থাৎ সে বস্তুকে তাহার মনের সম্মুখীন না করিলে, তাহার মন সে বিষয়ে বদ্ধ না হইলে, জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সহজজ্ঞান সেই জ্ঞেয়বস্তুকে স্বভাবতঃ প্রত্যক্ষভাবে একেবারে মনের সম্মুখে আনিয়া দেয়; সুতরাং ইহা অপেক্ষা জ্ঞানলাভের, বিশ্বাস লাভের অধিকতর সন্তোষকর ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব। অবশ্য একথা সত্য যে, পদার্থ সম্মুখীন হইলেও, তাহার উপলব্ধি সকলের সমান হয় না। উপলব্ধিকারকের উপলব্ধি করিবার ক্ষমতার উপর উপলব্ধির তারতম্য নির্ভর করে; কাহারও উপলব্ধি-শক্তি অধিক ও অধিকতর পূর্ণ, কাহারও তাহা কম, অপূর্ণ ও সামান্য। কিন্তু একথা যেমন সহজজ্ঞানের প্রমাণ বিষয়ে খাটে, তেমনই অন্যান্য সকল

প্রকার প্রমাণের বিষয়েও খাটে। সহজজ্ঞানোদ্ভূত যে প্রমাণ, তাহা অন্য অন্য প্রমাণ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ও অতীব সন্তোষকর এবং তজ্জাত বিশ্বাস সর্ব্বাপেক্ষা অটল।

মানুষের সকল শক্তিই অপূর্ণ ও ক্ষীণ, মনুষ্যের সমস্ত প্রকৃতিই এইরূপ। সহজজ্ঞান সেইরূপ অপূর্ণতাসংযুক্ত। মনুষ্য তাহার দুর্ব্বলতার বিষয় জ্ঞাত আছে এবং জীবনে সততই চেষ্টা করে, যাহাতে ইহার কুফল নিবারণ করিতে পারে। এজন্য শক্তিসকলের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয় এবং তদ্দ্বারাই, যতদূর সম্ভব, এই অপূর্ণতা বিদূরিত হইয়া শুভফল উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া একশক্তির কার্য্যের অপূর্ণতা অপরশক্তির কার্য্যের দ্বারা সংশোধন করারও চেষ্টা হইয়া থাকে। আর এক কথা আছে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মনুষ্য একই মণ্ডলীভুক্ত। ইহার মধ্যে একজনের ভ্রম ও অভাব অপর এক জনের পূর্ণতার দ্বারায় বিদূরিত হয়, ও ইহার মধ্যে যে যত সুশিক্ষিত ও অভ্যস্ত, তাহার উপর তত নির্ভর ও বিশ্বাস স্থাপিত হয়। এইরূপে মনুষ্যসমাজে মানব পরস্পরের সহায়তা দ্বারা অপূর্ণতার মধ্যেও, যতদূর সম্ভব, শুদ্ধভাবে জ্ঞানলাভ করিতে ও কার্য্য করিতে চেষ্টা করে; তাহাতেই অপূর্ণতা ও অভাবের ফল অনেকটা তিরোহিত হয়। তথাপি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে যাহা নিজে অনুভব করে, তাহাতে ভ্রম আছে মনে হইলেও, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। সে সম্বন্ধে তাহার অন্তরে মূলতঃ একপ্রকার বিশ্বাস থাকিয়া যায়—তাহা যে মূলতঃ সত্য, এ ধারণা তাহার মন হইতে অন্তর্হিত হয় না। কেবল চেষ্টা হয়, বুঝিতে যে কোথায় তাহার ভুল হইল, কোথায় তাহার ত্রুটী হইল, এবং তাহার উপলব্ধির মধ্যে

ভ্রান্তির কারণ কোথায়। এ সকল বুঝিয়া, নিজ উপলব্ধির পরিচয়ের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া, মানুষ ভ্রম সংশোধন করে। আমাদের বহিরিন্দ্রিয় সকল সম্বন্ধে সতত মানুষ এইরূপ কার্য্য করে, এবং সহজজ্ঞান সম্বন্ধেও সেইপ্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য, মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তি আছে। এ সকল শক্তির প্রত্যেকটীই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বিষয় উপযুক্ত-ভাবে প্রদর্শন করে, এ বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতিগত ও সহজজ্ঞান-সম্ভূত ; অর্থাৎ এই প্রত্যয় আছে যে, প্রত্যেক শক্তিই আপন আপন কার্য্য করে ও স্বীয় নিয়োজিত বিষয় প্রদর্শনে প্রকৃত সত্যপ্রদায়ী। যে শক্তি যে বিষয়-সম্বন্ধীয়, সে শক্তি ঠিক আপন বিষয়টী সত্যরূপে, যথার্থরূপে দেখায়। অনেক সময় যে ভ্রম হয়, তাহা ঐ শক্তির ঠিক কার্য্যটী না বুঝার জন্য হয়। সূর্য্য বা চন্দ্র প্রকাণ্ড বস্তু, কিন্তু চক্ষুতে ছোট দেখায়। এখানে সহজে মনে হইতে পারে যে, তবে চক্ষুর শক্তি আমাদিগকে ভ্রান্তভাব প্রদান করিয়া, ঠিক সত্যটী দিল না। এ সিদ্ধান্ত যে ঠিক নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। দূরের বস্তু ছোট দেখায়, ইহা একটী প্রকৃত তত্ত্ব। যে দৃষ্টি চক্ষু দিল, সে দৃষ্টি তো ছোটই, তাহার ছোটই হইবার কথা। সুতরাং চক্ষুশক্তির কোন দোষ নাই, সে যাহা প্রদান করিল, তাহা ভ্রান্তও নহে, কিন্তু ঠিকই। সূর্য্য ও চন্দ্র যে প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা অন্য উপায়ে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। সেইরূপ সূর্য্য ও চন্দ্রের যে আলোক আমরা পাই, তাহা অত দূর হইতে ঠিক যে ভাবে আমাদের নিকট প্রকাশিত হওয়া সম্ভব, ঠিক সেই ভাবেই প্রকাশিত হয়। এইরূপে সকল শক্তিই উপযুক্তরূপে আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই বিষয়ে

বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতিগত ও সহজজ্ঞানসম্ভূত। ইহা না হইলে জীবন ধারণ করাই মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব হইত; কেবল মানুষ কেন, কোন জীবই জীবনধারণ করিতে পারিত না। সেজন্য এই আপন শক্তির সত্যপ্রদর্শিতাতে বিশ্বাস প্রকৃতির ভিতরে সহজজ্ঞানরূপে নিহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সকলেই এ বিশ্বাস দৃঢ়রূপে পোষণ করে। ইহাতে ভ্রম হয় না। যাহা আমরা আপনার বুদ্ধিশক্তিতে উপযুক্তরূপে সিদ্ধান্ত করি, ফলতঃ তাহাই বাহ্যতঃ সংঘটিত দেখিতে পাই এবং আমাদের বিশ্বাস সততই দৃঢ়ীভূত হয়। আমরা মানি যে, ঘরে বসিয়া আপন বিচারশক্তিতে, বিনা ভ্রমে যাহা সিদ্ধান্ত করিব, জগতে তাহাই হইয়াছে দেখিতে পাইব। যদি ভুল হয়, তাহা হইলে বুঝিব যে, আমাদের সিদ্ধান্ত করিতেই দোষ হইয়াছে—যে বিচারশক্তি কার্য্য করিয়াছে, তাহার কার্য্যে দোষ নাই; অর্থাৎ কোন বিষয় দেখিতে কিম্বা ধারণ করিতে দোষ হওয়ায়, সে বিচারফলে দোষ হইয়াছে, নিজ বিচারশক্তির কার্য্যের কোন অপরাধ নাই। এইরূপ ভ্রমপ্রমাদের সময় সতর্কতা প্রদর্শন করি, কিন্তু সে শক্তির উপযুক্ত কার্য্যের উপরে আমাদের অবিশ্বাস হয় না; তাহা চিরদিন বিশ্বাসযোগ্য, এ ধারণা প্রবল থাকিয়া যায়ই যায়।

বিশ্বসংসারে পদার্থনিচয় ও জীবসকল যেন সবই স্বতন্ত্র ও পৃথক। একটীকে অপর একটী সম্বন্ধে কিছু জানিতে, কি অবগত হইতে হইলে, তাহার নিজের ভিতর এমন কোন ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক ও তাহাই আছে, যাহার দ্বারায় সে অপরের সঙ্গে সেইরূপ যোগাযোগ করিতে পারে ও তাহার বিষয় অবগত হইতে পারে। এই ব্যবস্থা ব্যতীত যোগাযোগের অন্য উপায় সম্ভব নহে, আর ইহা না হইলে

প্রত্যেকেই একেবারে চিরদিনের মত অনন্যগতি হইয়া, কেবল আত্ম-সম্বন্ধ হইয়া স্বতন্ত্রভাবেই থাকিয়া যায়। অতএব পরস্পরের যোগাযোগের উপায় এই ব্যবস্থাই, অন্য আর কিছু নাই। কিন্তু মানুষ যখন নিজশক্তির কার্য্যকে যথার্থ সত্য-প্রদায়ক বলিয়া বিশ্বাস করে, তখন সমস্ত ব্যবস্থার দিকে তাহার কোন দৃষ্টি থাকে না, এ যোগাযোগের ব্যবস্থা আপনা আপনি কার্য্য করিয়া যায়, সেই শক্তির কার্য্য-ফলের উপর তাহার বিশ্বাস ন্যস্ত হয়। মাতৃশরীরের রক্তকে দুগ্ধে পরিণত করিবার যন্ত্র সেই শরীরেই আছে, কিন্তু না মাতার, না শিশুর সে দিকে দৃষ্টি যায়; সকলের দৃষ্টি কেবল সেই দুগ্ধেরই উপর, তাহাই বিচার করে, ব্যবহার করে ও সম্ভোগ করে। সেইরূপ পদার্থসকলের ও জীবসকলের পরস্পর যোগাযোগের ব্যবস্থা যেমনই হউক না কেন, সে দিকে মানুষের দৃষ্টি থাকেনা; কেবল যে ফলিত যোগ বা জ্ঞান বা অবগতি লাভ হয়, তাহাই দেখে ও সেইটীই তাহার বিশ্বাসের বিষয় হয়। বাহ্যজগতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মানুষের দেহ ও মনে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক ব্যবস্থা আছে—কত ইন্দ্রিয়, কত মনের শক্তি ও ক্রিয়া আছে। সেই সকল কার্য্য করিয়া মানুষকে বহির্জগৎ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ করে। কিন্তু সে কার্য্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি সাধারণতঃ যায়না, তাহার দ্বারা যে জ্ঞানটী হয়, তাহাই সে গ্রহণ করে ও তাহার বহির্জগৎ সম্বন্ধে প্রবল বিশ্বাস লাভ করে। অর্থাৎ জগৎ যে সত্য ও স্থিতি করিতেছে এবং আমাদের শক্তি উপযুক্তরূপে কার্য্য করিয়া তাহাকেই প্রকৃতভাবে প্রকাশ করিতেছে, এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করে। এই যে বিশ্বাস, ইহা

সহজজ্ঞানলব্ধ। ইহা মানুষের মনে যেমন অন্য সকল সহজজ্ঞান সেইরূপ অত্যন্ত দৃঢ়। কিন্তু ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যকে উপলক্ষ করিয়া, অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিচার করিয়া দেখাইতে চাহেন যে, এ ভ্রান্ত। কত প্রকার জটিল তর্ক এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে উত্থাপন করেন, এবং আপাত দৃষ্টিতে ঐরূপ বিচার সহসা মন্দ মনে না হইলেও মানুষ তাহা গ্রহণ করে না; বহির্জগতে বিশ্বাস মনুষ্য-জাতির চিরদিন অটলই থাকিয়া যায় ও অটলই আছে। যদি তর্কবিচারের উপর নির্ভর করিয়া এ জ্ঞান লাভ করিতে হইত, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে তাহা এক অসম্ভব ব্যাপার দাঁড়াইত। বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান মানুষের শারীরিক ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্যদ্বারা লাভ হয়। এই সকল পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, যে জ্ঞান আমরা উপলব্ধি করি, তাহা বাস্তবিক বাহিরের জগতের নহে, পরন্তু আমরা আপনাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়েরই বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্ত্তনই উপলব্ধি করি। এবং তাঁহারা বলেন যে, তাহা হইলে বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইল কই; আমরা কিরূপে বলিতে পারি বা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, বহির্জগৎ প্রকৃত পক্ষে অবস্থিত। তাঁহারা আরও বলেম যে, ইন্দ্রিয় বিকল হইলে সে জ্ঞানও বিকৃত হয়, যেমন পাণ্ডু-রোগে হরিদ্রাবর্ণ দৃষ্টি ইত্যাদি; তাহা হইলে সে জ্ঞান বাস্তবিক বহির্জগৎ হইতে হইল কই? এ বিচার এক হিসাবে যুক্তি-যুক্ত ধরা যায়; এবং সেইজন্যই বোধহয়, এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানটীকেও সহজজ্ঞান-লব্ধ করা হইয়াছে, ও দৃঢ় করা হইয়াছে। এখানেই এই সহজজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা। যাহা হউক, এই পণ্ডিতেরা

কিন্তু বিবেচনা করেন না যে, এই উপায় ব্যতীত অন্য কি রূপে একবস্তু অপর বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারে—তাহা লাভ করিবার উপায় ত এই। দুইটি বিভিন্ন পদার্থ পরস্পরের সন্নিকটস্থ হইলে পরস্পরের উপর কোন না কোনরূপ আঘাত প্রতিঘাত হইবে এবং তাহারই ভিতর দিয়া পরস্পর পরস্পরকে জানিবে। যদি এই জানাকে জানা বলিয়া গ্রহণ করা না যায়, তাহা হইলে জগতে মেলামেশা একেবারে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এক বস্তুর সান্নিধ্যে আসিয়া অন্য বস্তু পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু সে তো নিজেই সেই পরিবর্ত্তিত ভাবে অবস্থিত করিল, যোগ আর হইল কই ? সুতরাং যোগ জানা অসম্ভব হইয়া যায়। কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতি যোগ দেখাইতেছেন—কত বস্তু কত বস্তুর সঙ্গে মিশিয়া যায়, কত বস্তু একেবারে অন্যবস্তুতে পরিণত হইয়া যায়। অতএব জগতের ব্যবস্থাতেই এই যোগের সৃষ্টি রহিয়াছে, ইহাকে অগ্রাহ্য করা যায় না, বিচার দ্বারা ইহাকে অসিদ্ধ বলিলে চলিবেনা ; যাহাতে অসিদ্ধ মনে না হয়, সেইজন্য এই সহজজ্ঞান মানুষ লাভ করিয়াছে।

অপরদিকে মানুষ জানে যে, ইন্দ্রিয়াদির বিকার হয় ও ভ্রম ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এ জন্য সকল শক্তিকে স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় রাখিতে মানুষ সতত চেষ্টা করে, এবং যে পরিমাণে সে সকল শক্তি সুস্থ, সুশিক্ষিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই পরিমাণে তাহার কার্য্যের উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া এক শক্তির কার্য্যের ভ্রম অপর শক্তির কার্য্যের দ্বারায় পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়—একজনের ভ্রম অপরের শক্তির কার্য্যদ্বারা সংশোধিত হয়। বিকার বশতঃ যে সমস্ত বিঘ্ন উপস্থিত হয়,

মানুষ তাহার প্রতিকার করে, কিন্তু সে সকল শক্তির কার্য্যের বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে তাহার বিশ্বাস অটল থাকে, এবং বহিরিন্দ্রিয় সব যে বহির্জগৎকে সত্যই প্রকাশ করিতেছে, তাহাও অটল ভাবে চিরদিন বিশ্বাস করিয়া থাকে। কোন কোন অতীব শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রকারেরাও এ বিশ্বাসকে অবিদ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এবং যথার্থ জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষায় ইহার বিনাশ-সাধনে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং সে বিনাশ-সাধনকে অবিদ্যা হইতে মুক্তি-লাভ বলিয়াছেন। কিন্তু যদিও এত দৃঢ় প্রযত্নের সহিত সাধনের চেষ্টা হইয়াছে, তথাপি ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলেও দেখা যায় না যে, সত্যই কেহ কখন ঠিক প্রকৃতরূপে এ সাধনে সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন ও এভাবে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এই যে সহজজ্ঞান, মনুষ্যের প্রকৃতি হইতে কখনই নির্ব্বাপিত হইতে পারে না; সেইজন্যই চিরকাল মানুষ আপন শক্তির উপযুক্ত কার্য্যের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিয়াছে এবং বহির্জগতে যে সত্য স্থিতি করিতেছে, তাহাও বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। সহজজ্ঞানের উপর মানুষের যে অটল বিশ্বাস, তাহা তাহার প্রকৃতিভূত। সাধারণ জীবজন্তুর যেরূপ সংস্কার সকল আছে, মানুষের সহজজ্ঞান তৎস্থানীয় একটী জিনিষ। জন্তুগণ যেমন সংস্কারের বাহিরে কার্য্য করিতে পারে না—সংস্কার তাহাদের প্রকৃতির অঙ্গবিশেষ—মানুষের পক্ষে সহজজ্ঞানও তদ্রূপ। মধুমক্ষিকাকে কেহ কখন সমস্তদিন শ্রম হইতে নিরস্ত করিতে পারে না—সুন্দররূপে মধুচক্র-নির্ম্মাণকার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পারে না—এরূপ করা মধুমক্ষিকার প্রকৃতিগত। সেইরূপ অন্যান্য জীবের সংস্কারগুলি তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতির

অঙ্গ। জীব সকল আপন আপন জীবনের পন্থা লইয়াই সৃজিত হইয়াছে।

কোন জীবই এমনভাবে সৃষ্ট হয় নাই যে, তাহাকে যেদিকে ইচ্ছা কিম্বা যে ভাবে ইচ্ছা, সেইদিকে বা সেইভাবে পরিণত করা যায়। সকলেরই নির্দ্দিষ্ট পথ রহিয়াছে। মনুষ্যেরও সেইরূপ। মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহার সহজজ্ঞান। যদিও তাহার প্রকৃতিতে স্বাধীনতার ক্ষেত্র সন্নিবেশিত আছে, তত্রাচ তাহার মধ্যে এই যে সহজজ্ঞান, তাহাকে অতিক্রম করিয়া সে চলিতে পারে না। যতদিন মানুষ মানুষ থাকিবে, ততদিন এ সহজজ্ঞান তাহার প্রকৃতি-গত থাকিবেই। ইহা তাহার মঙ্গলেরই কারণ।

জীবেরা সংস্কারবশতঃ যে যে পথ গ্রহণ করে, তাহাতে তাহারা সত্যই লাভ করে, তাহাদের তাহাতেই কল্যাণ হয়। আমাদের জ্ঞান আছে, অন্য জীবের সংস্কার সম্বন্ধে আমরা বিচার করি, আমরা দেখি যে, তাহারা ঠিক পথেই চলিতেছে—সেপথে কোন অমঙ্গল নাই। মনুষ্যের সহজজ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা যাইতে পারে। সহজজ্ঞান হইতে মানুষ যাহা প্রাপ্ত হয় তাহা, অন্য জীবের সংস্কার-লব্ধ বিষয়গুলি যেমন ভ্রমবিহীন ও মঙ্গলপূর্ণ, সেইরূপই সত্য ও কল্যাণপ্রদ; এবং এই সহজজ্ঞানের উপর যে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলে, ইহা অতি উপযুক্ত ব্যবস্থা।

মানুষের শক্তি সকলের কার্য্য দ্বারা যে সত্য অনুভূত হয়, তাহা ঠিক বিশ্বাসের উপযুক্ত বিষয় নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য—অর্থাৎ শক্তি সকল বিশ্বাসের যোগ্য নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য—বৈজ্ঞানিকেরা কত না তর্ক বিচার উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাদ্বারা

তাঁহারা সহজজ্ঞানকে উড়াইয়া দিতে চাহেন এবং বিচারবুদ্ধিকেই সর্ব্বস্ব করিয়া স্থাপন করিতে চাহেন। বিচারবুদ্ধি (reason) মানুষের পরম সহায় ও অত্যন্ত হিতকারী বন্ধু। ইহা না হইলে মানুষের জীবন চালানই কঠিন। সকল অবস্থাতেই ইহার প্রয়োজন ও মানুষের যত কিছু উন্নতি, ইহারই সহায়তা লইয়া হইয়াছে। যত জ্ঞানের চর্চ্চা, বিজ্ঞানের উন্নতি, সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি, সমস্তই ইহারই ফলে। জীবনে সকল বিষয়েই ইহার কার্য্য দৃষ্ট হয়। এই সকল উপকারিতা অনুধাবন করিয়াই মনে হয়, বৈজ্ঞানিকেরা ইহার উপর এত জোর দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহজীবনের সচরাচর সকল কার্য্যেতেই ইহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কিন্তু এই বুদ্ধির বিচার পূর্ব্বপ্রকাশিত ও পূর্ব্বস্বীকৃত বিষয় সকলের উপর নির্ভর করে, আগে সেইগুলিকে (axioms) আমরা স্বীকার করিয়া লই, পরে সে সকল হইতে বিচার দ্বারা অন্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই। সুতরাং সেইগুলিকে স্বীকার করিতে ও গ্রহণ করিতে গিয়া, অন্য এক শক্তির কার্য্যকে প্রথমতঃ বিশ্বাস করিতে হইতেছে। এই যে বিচার-বুদ্ধি-শক্তির কার্য্যই যে বিশ্বাসের যোগ্য, ইহাও প্রথমে স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহাইত সহজজ্ঞান-সম্ভূত। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে সকল বিষয় আমরা পূর্ব্বস্বীকৃত বলিয়া গ্রহণ করি, সেগুলি যদি ভ্রান্তিমূলক হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় ও সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। একটী দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতে পারে। য়ুরোপীয় পণ্ডিত গ্যালিলিওর পূর্ব্ব হইতেই লোকের ধারণা ছিল যে, প্রকৃতিতে শূন্যতা থাকিতে পারে না (Nature avoids vacuum); এবং এই জন্যই জলতোলা

পম্পের মধ্যেকার বায়ু বাহির করিয়া লইলে, সেই শূন্য যায়গায় পম্পের ভিতর জল আসিয়া ভরিয়া যায় এবং সেই জন্যই পম্পে জল উঠে। এইটী স্বীকৃত বিষয় হইল। একবার লোকেরা খুব বড় একটা পম্প গঠন করিয়া জল তুলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ৩২ ফুটের উর্দ্ধে পম্পের ভিতর আর জল উঠিল না, বাকী স্থান খালি রহিয়া গেল। তখন সকলে মহাত্মা গ্যালিলিওর নিকট সমস্যা সমাধানের জন্য উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, প্রকৃতিতে শূন্য স্থান থাকেনা বটে, কিন্তু তাহা এই ৩২ ফুট পর্য্যন্তই। এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত, কারণ পূর্ব্বস্বীকৃত বিষয়টীই ভ্রান্ত। গ্যালিলিওর নিজ শিষ্য টরিচেলি পরে ইহা তদন্ত করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোন বিচারের সিদ্ধান্ত তখনই ভ্রমশূন্য হইবে, যখন পূর্ব্বস্বীকৃত বিষয়গুলি ভ্রমশূন্য হয়; কিন্তু অল্পস্থলেই সে গুলির অভ্রান্ত হওয়া সম্ভব। বরং এ কথা বলা চলে যে, প্রায়ই সেগুলি ভ্রমযুক্ত, এরূপ দ্বিধা মনে থাকিয়াই যায়। কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী বিচক্ষণ বিচারক কোন বিষয়কে আপাততঃ সত্য বলিয়া ধার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু কালসহকারে তাঁহার ধারণার অসত্যতা প্রতীত হইয়া পড়ে। ইউক্লিড কত সুন্দর সুন্দর পূর্ব্বস্বীকৃত বিষয় সকল লইয়া উৎকৃষ্ট ভাবে জ্যামিতি গঠন করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে আইনষ্টাইন্ সে সকল বিষয়ে কতই সন্দেহের কথা উত্থাপন করিতেছেন। অতএব জ্ঞানবিচারের সিদ্ধান্ত কালে কোথায় দাঁড়াইবে, তাহার স্থিরতা কিছুমাত্র নাই। এ স্থলে মানব-জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় গভীর মৌলিক বিষয়গুলিকে এ প্রকার বিচারের উপর নির্ভর করিতে দিলে,

কোন কিছুর স্থিরতা থাকেনা ও মহা অনিষ্টের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়।

সে জন্যই মনুষ্য-প্রকৃতির ভিতরে সহজজ্ঞানরূপ শক্তি প্রয়োজিত হইয়াছে। অবশ্য নিম্নশ্রেণীর জীব ও জন্তুদের সংস্কারের মত ঠিক এই সহজজ্ঞান নহে, অথচ খানিকটা মানুষ ইহা হইতে লব্ধ বিষয়কে বিশ্বাস না করিয়া, সে সত্যকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বাধীন শক্তিও ইহার উপর কার্য্য করে। বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞানের উপর এ সকল গুরুতর বিষয় সংস্থাপিত হইতে পারে না। বিচারবুদ্ধি-জ্ঞান মানুষের পক্ষে অতীব আবশ্যকীয় হইলেও, তাহাদের কার্য্য তাহাদের নিজ ক্ষেত্রের মধ্যে বদ্ধ থাকে। তাহা সহজজ্ঞানকে অতিক্রম করিতে পারে না।

পূর্ব্বকালে ভারতে জ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত আদর ছিল। ঋষি মহর্ষিগণ ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে জ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সহজজ্ঞানও সংশ্লিষ্ট ছিল, মনে হয়। যখনই তাহাকে অতিক্রম করিয়া সাধনা হইয়াছে, তখনই মানুষ তাহা প্রকৃতপক্ষে জীবনে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। সহজজ্ঞানে মানুষ উপলব্ধি করে যে, সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে—হীন মানব-আত্মার সঙ্গে—স্রষ্টার বিভিন্নতা রহিয়াছে। যখন এই বিভেদজ্ঞানকে ধ্বংস করিয়া মানুষ মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিল, কার্য্যতঃ সে মুক্তি যে প্রকৃত পক্ষে কাহারও লাভ হইল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিলনা। এ মুক্তি মতের মুক্তি, মতেই রহিয়া গেল। সাধনা, প্রগাঢ় সাধনা হইল বটে, এবং

তাহা হইতে জীবনেও অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট ফল হইল বটে, কিন্তু মানুষ যে পূর্ণব্রহ্মের সঙ্গে একেবারে এক, ইহা কার্য্যতঃ জীবনে কখনই সংক্রামিত হইল না। এ সহজজ্ঞান, এ বিভেদজ্ঞান চিরদিনই মানুষের জীবনে প্রবল রহিয়া গেল। সহজজ্ঞান সুতরাং অত্যন্ত প্রবল—সে বিশ্বাস অটল, তাহা কিছুতেই বিধ্বংসিত হইবার নহে। মনুষ্য-জীবনের ইহাই এক অমূল্য উপাদান।

ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক সহজজ্ঞান।

মনুষ্য-জীবনে সহজজ্ঞানের বিশেষ আবশ্যকতা অবশ্যই বোঝা গেল। মানুষের প্রকৃতিতে সহজজ্ঞানরূপ শক্তি আছে, এবং সেই শক্তির নিয়মিত পথেই মানুষের জীবন অবশ্যই চলিবে। এ জীবন যেমন তেমন করিয়া চালাইবার জন্য হয় নাই, নির্দ্দিষ্ট পথেই ইহাকে যাইতে হইবে। মানুষ যাহাতে সেই পথে যাইতে পারে, সেই জন্যই মানুষকে শক্তি সকল প্রদত্ত হইয়াছে। সহজজ্ঞান সেই শক্তি-সমূহের অন্যতম একটী। এই সহজজ্ঞান বিবিধ বিষয়-সম্বন্ধে আছে, যেমন যেমন প্রকাশিত হয়, তেমন তেমন বোঝা যায়, ধরা যায়। এখন প্রশ্ন এই যে, মানুষের যে ঈশ্বর-সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তাহা সহজজ্ঞান-সম্ভূত কিম্বা অন্য কোন প্রকারে উদ্ভূত। পূর্ব্বে যে সব আলোচনা হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, যে বিষয় অন্যরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, সে বিষয় প্রকৃতি প্রত্যক্ষ-ভাবে দান করে না, সেই অন্যরূপেই তাহার প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকে; এবং আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সসীম অপূর্ণ পদার্থ-সমূহের মধ্যে

সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত হইয়া, মনুষ্যের পক্ষে সে সকল হইতে অসীম অনন্ত পূর্ণের ভাব প্রাপ্ত হওয়া একেবারে অসম্ভব। সুতরাং এই অসীম অনন্ত পূর্ণের ভাব সাক্ষাৎরূপে মানুষকে না দেওয়া হইলে, মানুষ এ ভাব লাভ করিতে পারে না। ইহাও আমরা পরিষ্কার দেখিয়াছি যে, মনুষ্য-জীবনের পক্ষে এ ভাব একান্ত অনিবার্য্য, ইহা না হইলে এ জীবন মনুষ্যজীবনই হয় না—ইতরজীবের জীবন হইতে তাহার কিছুই প্রভেদ থাকে না, তাহার কষ্ট যন্ত্রণার সীমা থাকে না, তাহার জীবনের সাফল্যলাভ হয় না, কোনরূপ উন্নতি—যাহা এখন দেখা যাইতেছে—তাহা অসম্ভব হইত। এ অবস্থায় এ ভাব মানুষকে সহজজ্ঞানরূপে প্রদান করা নিতান্ত আবশ্যক এবং সেই জন্যই ইহা মানুষকে প্রদত্ত হইয়াছে। জীবজন্তুদিগকে যে সংস্কার দেওয়া হইয়াছে, এ সহজজ্ঞান তাহা হইতে বিভিন্ন প্রকারের। এই সহজজ্ঞান হইতেই মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, স্বাধীন প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হয়, এ পর্য্যন্ত আমরা পূর্ব্ব আলোচনায় পাইয়াছি।

এক্ষণে এই যে অসীম অনন্ত পূর্ণতার জ্ঞান মানুষ সহজজ্ঞান দ্বারায় কিরূপে পাইতেছে, তাহা দেখা যাউক। আমরা যে চারিদিকের সমুদায় বিষয়, পদার্থ ও ঘটনাদি দেখি—নিজেদের জীবন দেখি, অন্যদের জীবন দেখি—তাহাতে আমাদের মন কি সন্তুষ্টি লাভ করে? সকলকেই বলিতে হইবে যে, তাহা কখনই হয় না। আমরা তদপেক্ষা আরও ভাল, আরও পূর্ণ কিছু দেখিতে চাই, পাইতে চাই। এই যে যাহা পাই, তাহা অপেক্ষা আরও পূর্ণ কিছু চাই, এ ভাব কেন হয়? আর সেই আরও পূর্ণ কিছু কি, কি হইলে তাহা পাওয়া যায়, সে

বিষয়ে আমাদের অন্তরে অন্তরে একটা কিছু ধারণা আছে—অবশ্যই আছে; তাহা না হইলে এ রকম আকাঙ্ক্ষা হইবে কেন? এবিষয় অনুধাবন করিলেই দেখা যায় যে, যাহা আমরা দেখি, তাহাই অপূর্ণ মনে হয়। অপূর্ণ কেন মনে হয়?—এই জন্য যে, আর কিছু পূর্ণ বস্তু আছে, মন তাহা অবশ্য অনুভব করে, সেই জন্যই এই অপূর্ণতা মনে আইসে। অতএব আমরা সেই অসীম অনন্ত পূর্ণভাবের আভাস এইখানেই পাইতেছি। এই আভাস এই জন্যই পাইতেছি যে, সেই অনন্ত অসীম পূর্ণকে আমরা এই আভাসরূপে দেখিতে পাইতেছি বলিয়া; নতুবা এরূপ ভাব মনে উদয় হইত না।

আবার কোন পদার্থকেই আমরা একেবারে স্বাধীন—আপনি আপনার কর্ত্তা—ইহা দেখিতে পাই না। সকলেই অন্যের উপর নির্ভরশীল, আশ্রিত। এই যে মানুষের আশ্রয়-আশ্রিতের ভাব, ইহা একটী বিশেষ ভাব, ইহার সঙ্গে নৈতিক জ্ঞানের সম্বন্ধ আছে। ইতরজীবদের ঠিক এ ভাব নাই। ইহার সঙ্গে মানুষের এক প্রকার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের জ্ঞান আছে। যাহা হউক, এই নির্ভরের ভাব, আশ্রয়-আশ্রিতের ভাব চারিদিকে রহিয়াছে, মানুষ দেখিতে পায়। ইহাতেই আভাস বোধ হয় যে, এমন কিছু আছে, যাহার উপর সকলই নির্ভর করে—যাহা পূর্ণ ও অসীম এবং যাহা আশ্রয় দিবার উপযুক্ত। এই আভাস মানুষ পায়। বাহ্যবস্তুসকলে এই ভাব কিছু ঠিক প্রকাশ পায় না। যদি পাইত, তাহা হইলে ইতর জীবজন্তুরাও হয়ত তাহা বুঝিতে পারিত। মানুষের নিজের মনের মধ্যে কিন্তু এমন একটী বিশেষ চক্ষু আছে—শক্তি আছে বলিয়াই, এই আভাস উপলব্ধি করে। সেই শক্তিই, সেই জিনিষই সহজজ্ঞান।

পূর্ব্ব আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, ঘটনাসকল জগতে ঘটিয়া যাইতেছে—একটীর পর একটী হইতেছে—এই ক্রম জগতে রহিয়াছে; কিন্তু কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-দর্শনোপযুক্ত সহজজ্ঞান কেবল মানুষেরই আছে বলিয়া, মানুষ সেই সকল ঘটনার ভিতর কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে দেখিতে পায়। ঠিক সেইরূপ পদার্থসকল—জীবজন্তুসকল—তাবৎ বিষয়-ব্যাপার জগতে রহিয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু সে সকল যে অসীম অনন্ত পূর্ণ আশ্রয়ের সহিত আশ্রয়-আশ্রিতরূপে আবদ্ধ, ইহা মানুষ দেখিতে পায়, বুঝিতে পারে, ঠাওরাইয়া ধরিয়া ফেলিতে পারে। এই জন্য পারে যে, এ বিষয় দেখিবার উপযোগী মানুষের সহজজ্ঞানরূপ চক্ষু আছে; তাহা না হইলে এই আশ্রয়-আশ্রিতরূপ সম্বন্ধ একেবারে তাহার নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিত। সুতরাং এই সহজজ্ঞানই এই দর্শনের মূলে—ইহাই দেখিবার শক্তি। এ শক্তির দ্বারায় চারিদিকের বিশেষ বিশেষ পদার্থ ও বিষয় দেখিয়াই মানুষ যখন এ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিল, তখনই মানুষ সেই পদার্থ-সকলের সঙ্গেই সেই অপর পদার্থ—যাহার উপর এ সব আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে—অবশ্যই দেখিল। সে দেখা পূর্ণ নহে, কিন্তু আভাসমাত্র। এ আভাস দেখাইয়া দিল—কেবল আভাসরূপেই দেখাইয়া দিল যে, এ আশ্রয় অনন্ত, অসীম ও পূর্ণ। এইটীই সহজজ্ঞানের কার্য্য। মানুষ বুঝিল যে, কোথায় এক অনন্ত, অসীম, পূর্ণ আশ্রয় রহিয়াছে, আর সমস্ত পদার্থ ও কার্য্য তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের ও সকল পদার্থের শক্তি ও ক্ষমতার দৌড় খানিক দূর পর্য্যন্ত—সীমার মধ্যে ও অপূর্ণ—কোন কিছু সম্পন্ন করা খানিক দূর

পর্য্যন্ত সম্ভব হয়, তাহার অধিক আর হয় না, সবই সম্পূর্ণরূপে সেই আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে। এইটী প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি মানুষকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেই মানুষ ইহা দেখে—নিরীক্ষণ করে—প্রত্যক্ষ ভাবে দেখে, আর প্রমাণের অপেক্ষায় থাকে না। দেখে আর বিশ্বাস করে। এই সহজজ্ঞান-সম্ভূত জ্ঞান অথবা জ্ঞানের দৃঢ় আভাস মানব-প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চারিদিকের বস্তুনিচয়ও এই দৃষ্টিকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে।

সকল বস্তুই প্রকৃতপক্ষে এই অসীম অনন্ত পূর্ণ আশ্রয়কে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে, ইহা বুঝিবার শক্তি ইতর জীব জন্তুর নাই; মানুষেরও যদি সে শক্তি না থাকিত, তাহারাও ইতর জীবের মত ইহা বুঝিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু মানুষের এই বুঝিবার ও দেখিবার শক্তি—যাহা সহজজ্ঞান নামে অভিহিত—আছে বলিয়া মানুষ ইহা বুঝিতে পারে ও দেখিতে পায়। এই বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অসীম অনন্ত পূর্ণ নির্ভরের স্থল যিনি, তাঁহার দর্শন হয়, প্রথমতঃ আভাসমাত্র দর্শন হয়। ইহাই ব্রহ্মদর্শনের আভাস—ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্কুর। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে সহজজ্ঞান। চারি পার্শ্বের বস্তুসকল ইহাকে উদ্দীপিত করে। মানুষের প্রকৃতি স্বাধীন নৈতিক আধ্যাত্মিক বলিয়া, মানুষ ইহা পাইতে সমর্থ হইয়াছে এবং ইহা আছে বলিয়াই মানবের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হইয়াছে। মানুষের এইখানেই বৈশিষ্ট্য এবং এই জ্ঞানই মানুষের মহামূল্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি ইহা মানুষের প্রকৃতিগত,

তাহা হইলে যেখানেই মানুষ আছে, সেখানে সর্ব্বত্রই, সকল অবস্থায় ইহাকে তাহার মধ্যে বর্ত্তমান ও অবস্থিত দেখা যাইবে; কিন্তু তাহা কি দেখা যায়? এ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, হাঁ, এই রূপই হয়। যেখানে মানুষ আছে, সেখানে এ ভাব কোন না কোন আকারে আছে। উপযুক্তরূপ নিরীক্ষণে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সকল সংশয় দূর হয়। এই সহজজ্ঞানই মানুষের ধর্ম্ম-ভাবের মূলে। যখন সকল বস্তু ও ব্যাপারই এক অসীম অপার পূর্ণ আশ্রয়ের অধীন এবং তাহারই দ্বারা পরিচালিত, তখন মন সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও স্তম্ভিত ভাবে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করে, এবং মানুষের এই আশ্রয়-আশ্রিত ভাব হইতেই উপযুক্ত কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম-ভাবের অঙ্কুর। এই অঙ্কুর মনুষ্যজাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই উপলব্ধি করা যায়। ইহা হইতেই সকল ধর্ম্মের ও সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। ইহা হইতেই সমাজ-গঠন ও সামাজিক অবস্থার তারতম্য-বোধ ও তজ্জনিত কর্ত্তব্য-সকলের উপলব্ধি।

এই সহজজ্ঞান-সম্বন্ধে মানুষের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, জগন্ময় মানবমণ্ডলী মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া যে এত বিভিন্নতা ও এত সাম্প্রদায়িক বিভক্তা, প্রথম দৃষ্টিতে তাহা দেখিয়াই মনে হয়, তবে বুঝি ধর্ম্ম মানুষের কেবল স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার উপর নির্ভর করিতেছে, এবং ইহার প্রকৃত দৃঢ় ভিত্তি অন্য কিছুই নাই,—এ বিষয়ে কোন সহজজ্ঞান থাকিলে এত বিভিন্নতা কথনই হইত না। বাস্তবিক পক্ষে জগতে এ বিভিন্নতা প্রচুর পরিমাণেই আছে। কেহ কেবল এক তৃণ লইয়া পূজা করে, কেহ কোন একখণ্ড

প্রস্তরকে, কেহ কোন বৃক্ষকে, কেহ বা নদীবিশেষকে, কেহবা কোন জীবজন্তুকে, আবার কেহ মনুষ্য-হস্তনির্ম্মিত মূর্ত্তি বা প্রতিমাকে, কেহ কোন পুস্তককে, কেহ কোন মানবকে, কেহ কোন স্মৃতিচিহ্নকে, ইত্যাকার কেহ কোন কিছুকে ঈশ্বরজ্ঞানে আরাধনা করে। ইহার যেন আর অন্ত নাই। কোথাও নিয়মিত ভজনার জন্য প্রকাণ্ড ভজনালয় আছে, কোথাও দেবমন্দির আছে, কোথাও সামান্য কুটীরে পূজা উপাসনা হয়, কোথাও স্তূপ, কোথাও মঠ, কোথাও চৈত্য, কোথাও প্রোথিত প্রস্তর খণ্ড, কোথাও বৃক্ষের মূলদেশ, এইরূপে কত বিভিন্ন প্রকারের পূজার স্থান মানুষ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। আবার পূজার প্রকরণও কত প্রকার বিভিন্ন আকারের—কেহ একান্ত নীরবে ধীর নিস্তব্ধ ভাবে মানস পূজা করে, কেহ কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ জয়ঢাক প্রভৃতির তুমুল গর্জ্জনযুক্ত মহাসমারোহে পূজা করে, কেহ পুষ্প চন্দন দূর্ব্বাদল বৃক্ষপত্র দিয়া, কেহবা জলদ্বারা, কেহ গাত্রে ছাপ দিয়া তিলকাদি রেখা লাগাইয়া, কেহ জানু পাতিয়া, কেহ দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ হস্ত যোড় করিয়া, কেহ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, এইরূপ কত বিভিন্ন প্রকারে মানব পূজা করিয়া থাকে। আবার কত যোগী সন্ন্যাসী কত প্রকারে নিজ শরীর শোষণ করেন। ইহা ছাড়া ভাব ও আকারাদির ধারণা লইয়াও কতই বিভিন্নতা। এ বিষয়ে মানুষে মানুষে ব্যক্তিগতভাবে কতই বিচিত্রতা রহিয়াছে।

এ সকল দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এবং সহসা মনে হয়, এতই যে বিভিন্নতা রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কি কোন স্থানে কিছু ঐক্যস্থল—যাহা সহজজ্ঞানসম্ভূত—থাকা সম্ভব নয়? এই প্রকার

চিন্তাতে মন একেবারে যেন বিভ্রান্ত ও হতজ্ঞান হইয়া পড়ে। বাস্তবিকই এইরূপে নানা বিঘ্নের উৎপত্তি হয়। এবং ইহারই জন্য কোন কোন বৈজ্ঞানিকেরা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলেন যে, এখানে সহজজ্ঞান বলিয়া কিছুই নাই, সকলই মানবের অপ্রতিহত কল্পনার কাণ্ড। কিন্তু ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ধীর শান্তভাবে সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সমুদায় বিভিন্নতা সূক্ষ্ম ধর্ম্মভাবের আভাস হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। এবং এই ধর্ম্মভাব, এই ব্রহ্মদর্শনের অঙ্কুর সহজজ্ঞান হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। সহসা কিন্তু ভ্রান্তি জন্মায় যে, সহজজ্ঞানে মানুষ ঠিক উজ্জ্বলরূপেই ঈশ্বরকে দর্শন করে ; এবং সেই জন্যই মনে হয়, তবে কেন সে দর্শন-সম্বন্ধে এত বিভিন্নতা হইবে ? কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে, এ দর্শন উজ্জ্বল দর্শন নহে, ইহা তাহার আভাসমাত্র— অপরিহার্য্য আভাসমাত্র। মানুষ নিজ নিজ শক্তির ও বুদ্ধির উন্নতি ও সদালোচনা দ্বারা সেই আভাসকে উপযুক্তরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় ; এবং ক্রমে ঈশ্বরজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়—অন্তশ্চক্ষু খুলিতে থাকে এবং পরিণামে ঈশ্বর-দর্শনে সক্ষম হয়। মানবের ইতিহাসে ইহারই কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়—ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করিতেছে। এই সকল বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরের উপলব্ধি ও বাহ্যজগতের উপলব্ধি একই ধারায় চলিয়া থাকে। তবে ঈশ্বর-দর্শন অন্তর জগতের বিষয়, আর বাহিরের প্রকৃতি আদি সমুদায়ের দর্শন বাহিরের ব্যাপার।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বহির্জগতের দর্শনও সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কত তর্ক যুক্তি ইহার

বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হয়, কিন্তু মানুষ সে সকল অতিক্রম করিয়া, বহির্জগতের অস্তিত্ব যে প্রকৃতপক্ষে আছে, ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করে; এবং বুঝে যে, ঠিক যেমন জগৎ আছে, ইহাকে সেই ভাবেই ধরা হইতেছে, দেখা যাইতেছে, শুনা যাইতেছে ও ব্যবহার করা যাইতেছে। এই বাহ্জগৎ লইয়া কত গবেষণা, অনুসন্ধান ও কত বিজ্ঞানই রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। যতই হইতেছে, ততই এই জগৎ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রস্ফুটিত ও মার্জ্জিত হইতেছে। জ্ঞান বিজ্ঞান ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা ও মানবের আরাম স্বচ্ছন্দতার নূতন নূতন উপায় সকল উদ্ভাবিত ও প্রসারিত হইতেছে। সেই জগৎ—সেই প্রকৃতি—চিরদিনই দৃশ্যতঃ একই ভাবে আমাদের সম্মুখে বিরাজিত রহিয়াছে; কিন্তু প্রথমাবস্থায় ইহার গঠন, রচনা, কার্য্যকলাপ, শক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে মানুষের কত অজ্ঞতা ছিল এবং কত প্রকার বিভিন্ন মতামতই সে সকল বিষয়ে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, যাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে, পূর্ব্বকালের বিজ্ঞলোকেরাও এরূপ বিস্ময়-জনক মত পোষণ করিতে পারিতেন। আমাদের মনে হয় যে, আমাদের এক্ষণে অনেক উন্নতি হইয়াছে ও আমরা বাহ্জগৎকে অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিতেছি এবং পূর্ব্বকালের লোকেরা যেন কিছুই বুঝিতেন না। জগৎ কিন্তু সেই আছে, কেবল আমাদের জ্ঞানের উন্নতি ও জগৎকে বুঝিবার শক্তি ক্রমশঃই বাড়িতেছে। এ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে, তাহাকেও সম্যক্ কখনই বলা যায় না; ভবিষ্যদ্বংশীয়দের নিকট আবার আমাদের মত অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক যে মনে হইবেনা, কে বলিতে পারে। কিন্তু 'পূর্ব্বাপেক্ষা বহির্জগৎ-সম্বন্ধে বর্ত্তমান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান যে অনেক পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং কিয়ৎ পরিমাণেও আমরা সমধিক বুঝিতে পারিতেছি, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বহির্জগৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান ও পরিচয় এইরূপ ক্রমবিকাশ পাইতেছে এবং ভবিষ্যতেও পাইতে থাকিবে।

ঈশ্বর-দর্শন-সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। তিনি সেই নিত্য এক অসীম অনন্ত পূর্ণ সর্ব্বময়রূপে আছেনই। সহজজ্ঞানে আভাস-রূপে মাত্র উপলব্ধ হয়েন। মনুষ্যের ক্রমশঃ জ্ঞান, শক্তি, পুণ্য, যোগ্যতা যে পরিমাণে বাড়ে, সেই পরিমাণে অধিক হইতে অধিকতর স্পষ্টভাবে মানুষ তাঁহাকে দেখিতে পায় এবং বুঝিতে পারে। ঈশ্বরজ্ঞান-সম্বন্ধে উন্নতি এইরূপে ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। এ উন্নতির শেষ নাই, কারণ ঈশ্বর অনন্ত—তাঁহার শেষ নাই, এবং তাঁহার বিষয়ে জ্ঞানও অনন্ত। বহির্জগৎ বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয়, কিন্তু অন্তর্জগৎ সেরূপ নহে। ঈশ্বর অন্তরে মনের নিকট, একেবারে সম্মুখস্থ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হয়েন। মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। এই জন্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস অতি প্রত্যক্ষ, অতীব সুদৃঢ় ও প্রবল।

মনুষ্য-প্রকৃতিতে এই সহজজ্ঞান-শক্তিটী রোপিত হইয়াছে—ব্রহ্মদর্শনের এই অতি স্বল্প তরল আভাস তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। ইহা এমনি দেখিতে অতি সামান্য, অনন্ত অসীম পূর্ণস্বরূপের কেবল কিঞ্চিন্মাত্র ঐ আভাস। ইহা তরল মাত্র, ঘনীভূত নহে। ইহা লইয়া মানব-প্রকৃতির প্রারম্ভ। অনেকে ইহার কোন মূল্যই দিতে প্রস্তুত নহেন, এবং ইহা হইতে আর কি ফল উৎপন্ন হইতে পারে, এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা অমূল্য

রত্নখনির কেবল প্রবেশদ্বারের স্বল্প প্রকাশ মাত্র। ইহাকে অবলম্বন করিয়া যতই খনির মধ্যে মানুষ প্রবেশ করিতে থাকে, ততই কত জ্ঞান, কত আশ্বাস, কত নির্ভর, কত আনন্দ ও শান্তি প্রাপ্ত হয়। মানুষের স্বতন্ত্র ভাবের ও সজ্ঘবদ্ধ ভাবের শক্তি-সমূহ এবং অন্যান্য শক্তির সহিত মিলিত হইয়া, ইহা মানব-জীবনকে ইহকাল পরকালের মধ্যে কি সুখের ও স্বর্গীয় আনন্দের করিয়া তুলিয়াছে। ইহারই ভিতর হইতে সকল নিঃস্বার্থ প্রেমরস, সকল আনন্দরস, সকল ভক্তিরস উত্থিত হইতেছে এবং সকল প্রকার আশঙ্কা-নিবারণের বল ইহার সহিত অনুস্যূত রহিয়াছে—মানবের ইতিহাসে এ সকল ক্রমশঃই প্রকাশিত হইতেছে। যতই ইহার সঙ্গে অপর সব শক্তি, কর্ম্ম, ভাব, জ্ঞান ও চেষ্টা মিলিত হইতেছে, ততই ইহার বিকাশ-প্রাপ্তি হইতেছে—মানব হৃদয় রসাল হইতেছে—মানব-প্রকৃতি দেব-প্রকৃতিতে পরিণত হইতেছে। সত্য বটে, ইহার তরল অবস্থায় নানা সম্প্রদায়, বিবাদ ও ঘোর বিড়ম্বনার সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু সে সকলের অবসানের পন্থাও দেখা দিতেছে এবং পরিণামে যে মনুষ্য-জীবন যথার্থ সুখের হইবে, সেই অবস্থাও দৃষ্টি গোচর হইতেছে। ভক্তের সুখদা ভক্তি, নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর উদ্দাম নির্ম্মল কর্ম্ম, তাপিত প্রাণে শীতল শান্তি, ধর্ম্মজ্ঞানের প্রশান্ত জ্যোতিঃ এ সকলই ইহার প্রসূত ফল। সেইজন্যই এই সহজজ্ঞান মানুষের পক্ষে অমূল্য রত্ন-স্বরূপ।

ভগবদ্বিষয়ক ধারণা

ঈশ্বর-বিষয়ক অনুসন্ধানের প্রারম্ভেই প্রথম এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল যে, সর্ব্বত্রই মানুষ ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করে কেন? উপরোক্ত আলোচনাদি হইতে এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর অনেকটা দেওয়া হইয়াছে। আমরা পৃথিবীর অনেকপ্রকার পদার্থের ও জীবের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিলাম এবং সকল ঘটনার ভিতরও আবশ্যকমত প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম যে, সর্ব্বত্রই বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সর্ব্বত্রই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শক্তির স্বরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিছুই গুণশূন্য নহে। অনুসন্ধানে দেখিলাম যে, সকল বস্তুই তাহাদের নিজ নিজ ক্ষমতা, শক্তি ও গুণের অনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে; এই ক্ষমতা ও শক্তি তাহাদের জগতের সঙ্গে ব্যবহার করিবার পন্থা, ইহাকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের কিছু করিবার সাধ্য নাই। সত্য জগতে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সেই সত্য জানিবার কিম্বা বুঝিবার শক্তি যদি কাহারও না থাকে, তবে তাহা তাহার নিকট চিরদিনই অজ্ঞাত ও অপরিচিত থাকিয়াই যাইবে। বৈজ্ঞানিক সত্য বিজ্ঞানবিদের নিকট পরিচিত, কিন্তু সাধারণ মানুষের নিকট একেবারেই অপরিচিত। ঈশ্বরজ্ঞান সেইরূপ নিকৃষ্ট জীবের নিকট অপরিচিত। মানুষ ঈশ্বরকে মানে, তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে; এইজন্যই যে, তিনি যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এই সত্যটী মানুষ অনুভব করে—তাহার ইহা অনুভব

করিবার, দর্শন করিবার উপযোগী শক্তি আছে—তাঁহাকে দেখিবার সহজজ্ঞান-রূপ শক্তি আছে। ঈশ্বরের দর্শন ও তাঁহাতে বিশ্বাস ভিত্তিহীন বা অমূলক নহে। ইহা চতুষ্পার্শ্বের সামান্য পদার্থ হইতে উদ্ভূত কল্পনার সৃষ্টি-বিশেষ নহে। এই দর্শন সত্যদর্শন। ইহা মানুষের প্রকৃতিগত। যেখানে মানুষ, সেইখানেই ইহা বিদ্যমান। মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে, এ দর্শন ও বিশ্বাস তাহার থাকিবেই থাকিবে। ইহার অভাব আর মনুষ্যত্বের অভাব একই কথা, এজন্য এ বিশ্বাস না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সহজজ্ঞানে মানুষের যে ঈশ্বরদর্শন, তাহা কেবল আভাসমাত্র দর্শন এবং মানুষের স্বীয় স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা অনুসারে এই দর্শনেরও তারতম্য হয়। এখন এ বিষয়টী আরও কিঞ্চিৎ অনুশীলন করা যাউক। সহজজ্ঞানলব্ধ আভাসে মানুষের মন তুষ্ট হয় না, সে আরও জানিতে চায়। সুতরাং তাহার যত প্রকার শক্তি আছে, সমস্ত প্রয়োগ করিয়া সে ঈশ্বরকে বুঝিতে চেষ্টা করে। এখানেই তাহার যত কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচার, কল্পনা, উৎকর্ষ, রুচির শুদ্ধতা, চরিত্রের মহত্ত্ব প্রভৃতি আছে, সকলই এ কার্য্যে লাগিয়া যায় এবং সেই নিত্যবর্ত্তমান বিশ্বস্রষ্টাকে বুঝিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়। সহজজ্ঞানের উত্তেজনায় ও এই সকল শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, মানুষ তাঁহাকে আরও বুদ্ধির গোচর করিতে চায়। এই বুঝাই মানুষের ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণা (conception)। মানুষ সেই ক্ষীণ আভাসকে দৃঢ় পদার্থে পরিণত করিয়া ধারণা করিতে চায়। ঈশ্বর-সম্বন্ধে যত কিছু আলোচনা, সকলই এই ধারণামূলক। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার আপনার অস্তিত্বে অবস্থিত;

আমরা মনুষ্য, আমাদের যাহা করিবার, তাহা এই ধারণা লইয়াই করি। এই ধারণার মূলে দুইটী উপাদান রহিয়াছে। একটী সেই সহজজ্ঞান-প্রদত্ত বিকল্পবিহীন আভাস, আর দ্বিতীয়টী আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, কল্পনা, রুচি ইত্যাদির কার্য্যসম্ভূত প্রভাব। এই দ্বিতীয়টীর দ্বারা বহু বিভিন্নতা প্রকাশ পায়, আবার ইহাই বিশেষ বিশেষ উন্নতি ও মঙ্গল-সাধনের সহায়তা করে। ইহা যেমন বিচ্ছিত্তির কারণ, তেমনি আবার অনন্ত উন্নতিরও কারণ। যত মানুষ, যত সম্প্রদায়, ধারণার বৈচিত্র্যও তদনুরূপ। ঈশ্বর কেমন, কিরূপ ইঁহার ভাব, বিভিন্ন মানুষে বিভিন্ন, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ, উপাদান, জ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদির বিভিন্নতাই এইরূপ বিভিন্নতার কারণ। একটী দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, কয়েকজন অন্ধব্যক্তি, হস্তী কিরূপ জন্তু, বুঝিবার জন্য তাহার শরীরের পৃথক্ পৃথক্ অংশ স্পর্শ করিল। যে হস্তিদেহের যে যে অংশ স্পর্শ করিল, তাহার ধারণা সেই সেই অংশানুযায়ী হইল। সমগ্র হস্তিদেহের ধারণা কাহারও হইল না। সেই প্রকার মহান্ অনন্ত ঈশ্বর-বিষয়ে যে ব্যক্তি যেরূপ বুদ্ধিজ্ঞানাদি প্রয়োগ করেন, ঈশ্বর-সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা তদনুযায়ীই হয়। নিজ নিজ উন্নতির সঙ্গে ও যেমন যেমন ক্রমে অন্তর্দৃষ্টি খুলিতে থাকে, সেই পরিমাণে ঈশ্বর-ধারণার উন্নতিও পরিস্ফুট হইতে থাকে। সমস্ত অভিজ্ঞান উপযুক্তরূপে ও সমঞ্জসভাবে একত্রিত করিতে করিতে, ঈশ্বরের অনুভূতির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া যায়। মানববংশ ক্রমে ক্রমে এই পথেই অগ্রসর হইতেছে।

প্রত্যেক জীবন স্বতন্ত্র ভাবের; একজনের সঙ্গে অন্যের সম্পূর্ণভাবে

মিল নাই। যত ব্যক্তি, জীবন ততপ্রকার; যত সম্প্রদায়, তাহাদের কার্য্য, ভাব ও ব্যবহার তত বিভিন্ন; যত দেশ, তত তাহার অধিবাসিগণের রীতি, নীতি, ভাব, জীবন ও ব্যবহার সকলই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। এই সকলের সঙ্গে এবং প্রত্যেকেরই সঙ্গে কিন্তু ঈশ্বরের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ এবং ঘনিষ্ঠ ব্যবহার। সকলেই তাঁহাকে ডাকে, তাঁহার আশ্রয় চায় ও: তাঁহার আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়। তিনি সকলেরই পিতা, মাতা, বন্ধু ও আশ্রয়। প্রাণ ভরিয়া লোকে তাঁহাকে ডাকে এবং তিনিও যথাযোগ্যভাবে যাহার প্রতি যেমন ব্যবহার করিতে হয়, ঠিক সেইরূপই অভ্রান্ত ভাবে চিরদিন করেন। সুতরাং একের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার অন্যের সঙ্গে ব্যবহারের সমান হয় না। এজন্যই ঈশ্বর-বিষয়ক অনুভূতি একজনের যেরূপ হয়, অন্যের ঠিক সেইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। এই কারণেই দেশে দেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, মানুষে মানুষে, মণ্ডলীতে মণ্ডলীতে ঈশ্বরের অনুভূতি একেবারে সমান নহে; বিভিন্নতা ও পার্থক্য থাকিয়া যায়, এবং ধারণা-সম্বন্ধেও প্রভেদ জন্মায়। ধারণার প্রভেদ আছে বলিয়া, ধারণাকে একেবারে কল্পনাপ্রসূতও বলা যায় না। দেখা যায় যে, সরল বিশ্বাসীর ধারণা সর্ব্বত্রই সত্যমূলক। ভগবানের কোন না কোন গুণের বা কিছু না কিছু অনুভূতির উপর তাহা সংস্থাপিত। মানুষ কালের প্রভাবে যত জ্ঞান, ধর্ম্ম ও যোগ্যতায় সমুন্নত হইতেছে, ততই তাহার এই সত্যমূলক উপলব্ধির শক্তি বাড়িতেছে; এবং এই সমস্ত সত্য স্বয়ং ভগবানে অবস্থিত, ইহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে। এই কারণে ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণা ক্রমশঃ মানববংশে অধিক হইতে অধিকতর সত্যমূলক হইয়া আসিতেছে;

এবং মনুষ্যজাতি এইরূপে ক্রমশঃ ভগবানের সঙ্গে অধিকতর জীবন্তরূপে সংযুক্ত হইতেছে ও তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করিয়া ধন্য হইতেছে। সমস্ত মানবেতিহাস ইহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বাহ্যজগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। বাহ্যজগৎ অক্ষুণ্ণভাবে চিরকাল রহিয়াছে—মানুষও তাহাই চিরদিন দেখিতেছে, তাহা লইয়া ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু সেই সকল পদার্থ-সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ও পরিচয় কত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কত লোকের কতরূপ ধারণা ও কল্পনা। ক্রমে ক্রমে এইভাবে বাহ্যজগতের সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিজ্ঞান উন্নত হইয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে কতই অদ্ভুত সংস্কার ও সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, যাহা শুনিলে এখন হাস্য সম্বরণ করা যায় না। কেহ বলিয়াছেন, জল হইতে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, কেহ বা ধূম হইতে সকলের উৎপত্তি স্থির করিলেন, কেহবা অবিভাজ্য অণুসকল সৃষ্টির মূল, ইহা বলিলেন। কেহ আবার পঞ্চভূতকে সৃষ্টির উপাদান স্থির করিলেন। এইরূপে কত বিভিন্ন প্রকার মতের সৃষ্টি হইল। কেহ বা আবার ইথারের পক্ষপাতী, কেহ আকর্ষণ লইয়া ব্যস্ত। অথচ জগৎ যাহা, তাহাই রহিয়াছে। তাহার বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণ জ্ঞান এখনও লাভ করিতে পারে নাই। সেইরূপ ভগবান্ একই ভাবে যেরূপ তিনি, সেইরূপই রহিয়াছেন। মানুষের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার নিত্য নির্ব্বিকার ভাবেই রহিয়াছে, অথচ মানুষ তাঁহার বিষয়ে কত কি ভাবে, ধারণা করে—একজনের বা একজাতির ধারণার সঙ্গে

অন্যের বা অন্যজাতির ধারণা মিলে না। এই ভাবেই সমস্ত চলিয়া অসিতেছে।

সচরাচর যখন আমরা ঈশ্বর-সম্বন্ধে আলোচনা করি, আমরা আমাদের মনে তাঁহার সম্বন্ধে যে টুকু ধারণা হইয়াছে, তাহা লইয়াই কার্য্যতঃ সে আলোচনা করি; কিন্তু তিনি স্বয়ং বাস্তবিক যেরূপ, তাহার তুলনায় তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কত অপূর্ণ, ক্ষীণ ও ভ্রমপূর্ণ। এইটী মনে রাখিয়া আমাদের অপূর্ণতা দূর করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইতে হইবে। এইরূপ করিলে অনেক সময় বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা ও বিবাদ পরিহার করা যায়।

ইহুদীধর্ম্মাবলম্বীদের ধারণা এই যে, ঈশ্বর সকলের উপর রাজাধিরাজ। স্বর্গরাজ্য বলিয়া এক পৃথক রাজ্য তাঁহারা কল্পনা করিয়া থাকেন, যেখানে ঈশ্বর মহাসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। এবং সেইখান হইতেই অতি সূক্ষ্ম কঠিন ন্যায়-শাসনে তিনি শাসন করিতেছেন ও বিচার করিয়া থাকেন। এই জন্যই ইহুদীদের হৃদয়ের ভাবে ও চরিত্রে ন্যায়ের বড়ই প্রাধান্য। তাঁহারা একটী পয়সা দেনা পাওনা এদিক ওদিক করিতে চাহেন না। ইস্‌লামধর্ম্মের ভাব এই যে, ঈশ্বর মহাপ্রবল, সর্ব্বোচ্চ একাধিকারী—আল্লা হো আক্‌বর। তাঁহার সমান আর কেহ নাই। তাঁহার শাসন সর্ব্বজয়ী। এ কারণ কেহ যদি অন্য দেবতা মানে, ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীরা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। বুত্‌পরস্তকে তাঁহারা নিধন করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, তাহাতেই তাঁহার প্রতি কল্যাণ করা হইল। পুরাকালে গ্রীকেরা ভাবিতেন যে, জুপিটার সর্ব্বোচ্চ দেবতা, বজ্রাস্ত্র লইয়া সতত বিদ্যমান। শিখদের নিকট ঈশ্বর

গুরুরূপে প্রকাশিত এবং মানবসকল তাঁহার শিশ্য (শিখ্)। হিন্দুরা ভাবেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকল্প। এইভাবে তাঁহার ব্যাপিত্বই প্রবলরূপে অনুভূত। ক্রমে তিনি নির্গুণ সর্ব্বগুণাকর-রূপে প্রকাশিত। কিন্তু যিনি যে ভাবে তাঁহাকে দেখেন, তিনি সেই ভাবের একেবারে চূড়ান্তরূপী বলিয়া তাঁহাকে মনে করেন। যদি কেহ দেবী বলিয়া ধারণা করেন, তবে ভাবেন, তিনি অসীম সৌন্দর্য্যের আধার ইত্যাদি। এ সকলই ঈশ্বর-সম্বন্ধে বিশেষরূপে জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টার ও কল্পনার ফল। মানুষ সচরাচর ভৌতিক পদার্থ লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং সেই আকারেই তাঁহাকে বুঝিতে ও ধরিতে যায়, এবং ভৌতিক পদার্থের মধ্যে যাহা কিছু সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহা কিছু অসীম ও প্রকাণ্ড যাহা কিছু অতি সুন্দর, যাহা কিছু অতীব শক্তিশালী, তাহার স্বরূপ ঈশ্বরে আরোপ করিয়া থাকে। এইরূপে ভৌতিকচিন্তাবিশিষ্ট ব্যক্তি ঈশ্বর-কল্পনার ধারণা অন্তরে পোষণ করেন। সামান্য অসভ্য মনুষ্য মনে করে, ঈশ্বর কোন পুরাতন বিশাল বৃক্ষেতে বর্ত্তমান আছেন। হয়ত কোন ভূত বা বাতাসের আকারে প্রকাশিত হয়েন, অথবা প্রস্তরের মধ্যে থাকেন এবং সেই পাথর সেই জন্য সিন্দুর আদি দ্বারা রঞ্জিত করে। এইভাবে অসংখ্যরূপে মানুষের মনের মধ্যে ঈশ্বরের ধারণা বিরাজ করিতেছে। যিনি বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞানচর্চ্চায় দিন যাপন করেন, তিনি তাঁহার আপন মনের চিন্তানুযায়ী তাঁহার কল্পনা করেন। জগদ্বিখ্যাত মহামান্য পণ্ডিতবর শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাঁহার নিজ চিন্তানুযায়ী অদ্বৈতবাদ-মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আরও কত কত পণ্ডিত কত প্রকার চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। সার সত্য

এই যে, বিশ্বব্যাপী ভগবান্ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু তাঁহার বিষয়ে সকল কল্পনা ধারণাই সত্য নহে। অনেকস্থলে কল্পনা কল্পনাই। সেই জন্যই এত বাগ্‌বিতণ্ডা চলিয়া আসিয়াছে। প্রকৃত সত্যের অনেক পশ্চাতে এখনও মানুষ পড়িয়া রহিয়াছে। এই জন্যই নববিধান-প্রবর্ত্তক শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন, "পূর্ণধর্ম্ম ভবিষ্যতে"। শ্রীবুদ্ধদেব, বোধ হয়, এই জন্যই ঈশ্বর সম্বন্ধে কোথাও কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার উপদেশ মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কি প্রকাশ পায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব এই প্রশ্ন করিয়া উত্তর দিলেন যে, তিনি কি কখন এ অস্তিত্বে অস্বীকার করিয়াছেন? নানা মুনির নানা মত, নানা ধারণা ও তাহা লইয়া নানা বিতণ্ডা দেখিয়া সম্ভবতঃ তাঁহার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি এ সকল তর্কবিতর্ক, কলহ ও গোলযোগের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে নাই। কোনটীর সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া দিতে চাহেন নাই। তিনি এমন অবস্থায় লোকদের আসিবার উপদেশ দিয়াছেন, যে অবস্থায় আসিলে স্বভাবতঃই ঈশ্বর-দর্শন হইবে, অন্যকে কিছু বলিয়া দিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

ভগবান্ অনন্ত সত্যস্বরূপ। তাঁহার সঙ্গে সৃষ্টির ও প্রকৃতির কোন অমিল নাই, সমস্তই একতানে মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। ভ্রান্তধারণা হেতু অনেকস্থলে আমাদের পরস্পরের সহিত মিল থাকে না, বিকৃতভাব ধারণ করে। এজন্য সে সব ভ্রান্তি-নিরাকরণের এই উপায় দেখিতে হয় যে, একটা ধারণা আর একটীর সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, সৃষ্টির সঙ্গে মিলিতেছে কি না। এই চেষ্টা,

এই উপায় মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে চিরকাল বিদ্যমান আছে। তদ্ব্যতীত চিরদিনই মানুষের ইহা একান্ত আকাজ্ক্ষা যে, সৃষ্টির মধ্য দিয়া, বিশ্বকার্য্য-দর্শনের মধ্য দিয়া বিশ্বেশ্বরকে প্রাণে উপলব্ধি করে। তাহার ফলে তত্ত্বশাস্ত্র নানাভাবে, নানারূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং সেই সকল ভগবদ্‌বিষয়ক প্রমাণরূপে আখ্যাত হয়। বিরুদ্ধ-বাদীরা আবার নিজ নিজ কূটবিচার দ্বারা এই সকল তত্ত্বশাস্ত্র খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন এবং ভাবেন যে, তাহাতে সফলকাম হইলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব লোপ হইল, বা তাঁহার অস্তিত্বের কোন সন্তোষ-জনক প্রমাণ নাই। কিন্তু প্রকৃত সত্য কি? তাহা এই। মানুষ এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করে না। বিশ্বাস করে এই জন্য যে, তিনি আছেন জীবন্ত ঈশ্বররূপে—মানুষ তাঁহাকে দেখে, আর বিশ্বাস করে, এ দেখা অন্তশ্চক্ষুর দেখা। সহজজ্ঞানে আভাসমাত্র দেখে, পরে দৃষ্টির উন্নতির সহিত স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতরভাবে দেখে ও তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তাঁহার অস্তিত্বের কোন কারণ দেওয়া যায় না, কেন তিনি আছেন, কেহই সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ বা অধিকারী নহে। তিনি আছেন, সেই জন্যই তিনি আছেন, সত্যস্বরূপ হইয়া আছেন। এই জন্য আছেন, এরূপ কিছু হেতু দেওয়া যায় না। তিনি স্বয়ম্ভু, আপনি আছেন, আপনিই আছেন। সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি নির্দ্দেশ করিতে পারে না, কোন্ কারণে তিনি আপনি আছেন। কিন্তু তিনি আছেন বলিয়াই, মানুষ তাঁহাকে দেখে, বুঝে ও বিশ্বাস করে। এই কারণ নির্দ্দেশ করা যৎসামান্য অতিক্ষুদ্র একান্ত সীমাবদ্ধ মানব-শক্তির অতীত। উপরে ভগবদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া যাহা

সাধারণতঃ গৃহীত হয়, তাহা যদিও সে ভাবে অর্থাৎ অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা, কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা যে মনে করেন যে, উহার অযোগ্যতা প্রমাণ করিয়া আসল বিষয়কে খণ্ডন করিবেন, তাহাও তাঁহাদের দুরাশামাত্র। তাঁহাদের বিবিধ চেষ্টাকে অতিক্রম করিয়া, মানুষের বিশ্বাস চির দৃঢ় এবং জ্বলন্তভাবেই থাকিয়া যায়। এ সকল প্রমাণের অপূর্ণতা সত্ত্বেও, তাহার এই বিশ্বাসকে ও শুদ্ধ ধারণাকে দৃঢ়তর ও জীবন্ত করিয়া দেয়।

উপরি উক্ত আলোচনার ফল যদি কেহ বুঝেন যে, প্রকৃত ভগবদ্‌ধারণা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, তাঁহার সে সিদ্ধান্ত প্রকৃত পক্ষে ভ্রমাত্মক। বাস্তবজীবনে দেখা যায় যে, এই বিশ্বাস, এই ধারণা, এই যোগ সত্য সত্যই মানুষের বল, শক্তি, আশা ও শান্তি পাইবার একমাত্র উপায় ও স্থল। কাজেই এই বিশ্বাস ও ধারণা সম্ভূত উপাসনাদি মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য, তাহা হওয়া চাইই চাই ও সত্যই তাহা হইয়া থাকে। বিধাতার ব্যবস্থাই তাই।

উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, "আমরা যে তাঁহাকে জানি এমনও নহে, না জানি এমনও নহে এবং এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।" আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিয়া আসিতেছি যে, আমাদের শক্তি, আমাদের ধারণা ঈশ্বরকে ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারে না, আমাদের শক্তি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, ভ্রান্তিও ঘটে। ইহা সত্যবটে, কিন্তু আবার অন্য আর এক দিকও আছে। তাহা এই। যে সকল আলোচনা হইল, তাহাতে আমরা দেখিলাম যে, মানুষ তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে

যায় ও তাঁহার বিষয়ে অন্তরে ধারণা করে, কিন্তু তিনি যেন নিষ্ক্রিয় (passive) থাকেন, মানুষই তাঁহাকে বুঝিতে থাকে। যেমন বাহিরের বিশ্ব নিষ্ক্রিয়, মানুষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তাহার গুণাগুণ ভাব বুঝিয়া লয়। বিশ্ব আপনার অপ্রতিহত পথে আপনি চলে, মানুষই কেবল নিজ চেষ্টা দ্বারা তাহাকে বুঝিতে যায়, বিশ্ব যেন তাহাকে ঠিক সহায়তা করেনা। ভগবান্ বিষয়েও সেইরূপ ভাবে দেখা গেল। পৃথিবীতে প্রেমময়ী জননী যেমন শিশুকে গায়ে মাথায় উঠিতে দেন, আদর করে' কাপড় টানিতে চুল ঘাঁটিতে দেন, অথচ কিছু বলেন না। ভগবান্‌ও তেমনি প্রেমময়ী জননী-স্বরূপে আমাদেরই যা কিছু করিতে দেন, নিজে নিষ্ক্রিয়ই থাকেন। এ এক দিক হইল। কিন্তু আর একটী দিকও আছে। ভগবান্ স্বয়ং চেষ্টা করিয়া মানুষকে যেন নিজ পরিচয় দিতে চাহেন।

এই যে সহজজ্ঞান, তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে এই শক্তি, তিনিই তো আমাদের দিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, মানুষ তাঁহাকে জানিতে পারে, তাঁহাকে চিনিতে পারে। "এ পাষাণ অন্তরে, তোমারে জানিবার তরে, অযাচিত কৃপাগুণে রোপিয়াছ জ্ঞান-বল।" তাঁহার ইচ্ছাই এই। এইজন্যই তিনি মানুষের নিকট নিজে প্রকাশিত। যে তাঁহাকে জানিতে চাহে, তিনি তাহার নিকট নিজে প্রকাশিত হয়েন। এই প্রকাশ মনের মধ্যে এমন আকারে আইসে যে, তখন আর অস্বীকার করিবার বা ভুলিবার যেন পথ থাকেনা, সে প্রকাশ জলন্তরূপে মনকে অধিকার করে। সত্য বটে, ইহা মানুষের ক্ষুদ্র শক্তির ভিতর দিয়া গৃহীত

হয়; কিন্তু তাহাতে এমন একটা জ্বলন্তভাব থাকে যে, তাহা ভুলিবার নহে, যেন স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সত্যের ছবি তাহার মধ্যে রহিয়াছে। সরল সাধুপ্রকৃতির লোক, অভিমানশূন্য সাধক সহজেই সেই সত্যের আলোক দেখিতে পান, বুঝিতে পারেন। তাঁহাদের দর্শন একেবারে পূর্ণ না হইলেও সত্যমূলক।

কেবল যে প্রতি ব্যক্তির মনে তাঁহার প্রকাশের ব্যবস্থা আছে, তাহা নহে; কিন্তু মানবেতিহাসেও এই প্রকাশের বিধি আছে। সাধু মহাজনগণ জগতে জন্মান এবং ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট হইয়া মানুষকে অতি প্রাঞ্জলভাবে ও উজ্জ্বলরূপে ভগবানের কথা শুনাইয়া, তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক রাজ্যের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিয়াছেন ও তাঁহার বিষয়ে পরিষ্কার সত্যধারণা করাইয়া দেন।

এইরূপে নানাভাবে তিনি স্বয়ং মানুষের নিকট আপনার পরিচয় সক্রিয় (active) ভাবে দিয়া আসিতেছেন। এই জন্যই মানুষ তাঁহাকে জানিয়া আসিতেছে—তাঁহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত হইতেছে। যোগী, ঋষি, ভক্ত, সাধু, কর্ম্মী সকলেই তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইতেছেন। মনুষ্য-বংশে তাঁহার কৃপানিঃসৃত আশ্বাস আসিতেছে, শান্তি, আনন্দ ও আশা সকলই সত্যভাবে তাঁহার নিকট হইতে মনুষ্য লাভ করিতেছে। অবশ্য ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, এই সমুদায় প্রকাশ ও তাঁহার বিষয়ে যে সকল ধারণা মনুষ্য লাভ করিতেছে, তাহা সত্য হইলেও, তাঁহার নিজ স্বরূপ তদ্দ্বারা যথার্থতঃ প্রকাশ পাইলেও, মানুষের সঙ্গে তাঁহার জীবন্ত ও সত্য যোগ-সম্মেলন হইলেও, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ পরিচয় হইলেও, সে পরিচয় অতি সামান্য।

অনন্তের তুলনায় তাহা অতি ক্ষীণ রেণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। ভাবিতে গিয়া তাঁহার কূল কিনারা আমরা পাই না, বাক্য তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারে না, চিন্তা তাঁহাকে পূর্ণভাবে ধারণ করিতে পারে না। কেবল জ্ঞান-গরিমা যতক্ষণ থাকে, মানুষ মনে করে, তাঁহাকে বুঝিলাম। প্রকৃত সাধক যাহা কিছু একটা অস্পষ্টভাবে বুঝেন ও উপলব্ধি করেন, তাহাতেই অবাক্ হইয়া বলিয়া উঠেন, "জানিয়াও জানিলাম না—বুঝিয়াও বুঝিলাম না"। এই ভাবই প্রকৃত ভাব। উপনিষদের উপরোক্ত বচন ইহাই প্রকাশ করে। এই ভাবান্বিত হইয়া মানুষ তাঁহাকে আরও জানিবার জন্য যত আগ্রহান্বিত হয়—ব্যাকুল হয়—প্রার্থনা করে—সরল চেষ্টা করে, ততই ঈশ্বর আরও স্পষ্টভাবে তাহার নিকট প্রকাশিত হন। তাহাতে তাঁহার বিষয়ে মানুষের ধারণা আরও প্রশস্ততা ও গভীরতা লাভ করে।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রমাণের বিবিধ প্রণালী।

এপর্য্যন্ত যাহা আলোচনা হইল, তাহাতে দেখা গেল যে, মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস বাস্তবিক কোন বাহ্য প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে, কিম্বা সেইরূপ প্রমাণসাপেক্ষ নহে। তিনি আছেন এবং মনুষ্য তাঁহার সত্তা অনুভব করে ও তাঁহাকে দেখে, এইরূপে সহজজ্ঞানে তাঁহাতে বিশ্বাস হয়। প্রকৃতপক্ষে বিচার করিয়া, প্রমাণ গ্রহণ করিয়া, যুক্তিতর্ক করিয়া তবে বিশ্বাস করে না। তথাপি মানুষের মন চাহে যে, সঙ্গত বিচার দ্বারা তাঁহার বিষয় সমর্থন ও

প্রতিষ্ঠিত করে। সেই জন্যই সকল দেশে ও সকল কালে এইরূপ বিচারের ও প্রমাণের জন্য মানবপ্রাণে প্রয়াস লক্ষিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর কেন আছেন, ইহার কারণ কেহই দিতে পারে না। তিনি আছেন, তাই আমরা তাঁহাকে দেখি, বুঝি তিনি আছেন এবং তাঁহার অস্তিত্বে ও স্বরূপে বিশ্বাস হয়। তাঁহার থাকার কারণ থাকিলে তিনিই তাহা জানেন, অপর কাহারও তাহা বুঝিবার জানিবার শক্তি নাই। অনন্তই কেবল অনন্তকে জানেন ও জানিতে পারেন। যে সান্ত ও ক্ষুদ্র, তাহার জ্ঞানও সীমা-বিশিষ্ট, অপূর্ণ এবং যৎসামান্য। তাহার ঐ কারণ নির্দ্দেশের শক্তি কোথায়? অতএব তর্ক দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রকৃতপক্ষে করা যায় না। তাহা দ্বারা কেবলমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি আছেন। তাহার অধিক আর কিছু নহে। কেন ষট্‌কোণ-বিশিষ্ট মধুচক্র নির্ম্মাণ করিলে স্থানের বিশেষ সাশ্রয় হয়, তাহার কারণ মধুমক্ষিকা দিতে পারে না। পিপীলিকাও তাহার খাদ্যসঞ্চয় করিবার প্রয়োজনীয়তার কারণ দিতে পারে না। কুকুরও তাহার প্রভুভক্তির ঔচিত্যের কারণ দিতে পারেনা, কিম্বা জানেনা। ইহারা সকলেই আপন আপন সংস্কার অনুসারে নিজ নিজ পথ ও কার্য্য অনুসরণ করিয়া যায়। মনুষ্যও তাহার সহজজ্ঞানরূপ শক্তি দ্বারা সেইরূপ বিশ্বস্রষ্টাকে বিশ্বাস করে। তথাপি মানসিক-জ্ঞানবিশিষ্ট মানব নিজ জ্ঞানানুসারে সকল বিষয়েরই কারণ ও প্রমাণ অনুসন্ধান করে। ইহা হইতেই ঈশ্বরবিষয়ক প্রমাণের চেষ্টার সৃষ্টি। কিন্তু সে চেষ্টা দ্বারা প্রকৃত ও উপযুক্তভাবে কারণ-নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে।

ক্ষুদ্র সামান্য জ্ঞান, যাহা মানুষকে প্রদত্ত হইয়াছে, না অনন্তকে ধরিতে পারে, না সে সামান্য জ্ঞান অনন্তকে প্রমাণ করিতে পারে। ক্ষুদ্রের কারবার ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই রহিয়া যায়। তবে এই আলোচনায় কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান পরিতৃপ্তি লাভ করে ও ভগবানে বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। ঈশ্বরবিষয়ক প্রমাণ-সকলের মূলে এই অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে এবং তাহাই নানাভাবে অবলম্বন করিয়া, বিরুদ্ধবাদীরা এই সকল প্রমাণের অযোগ্যতা নির্দ্দেশ করিতে চান এবং পরিশেষে ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। এইরূপে তাঁহারা এ বিষয়ে সংশয় ঘটাইতে চাহেন। কিন্তু এ সকল বিচার দ্বারা যে সম্পূর্ণভাবে প্রমাণে উপস্থিত হওয়া যায় না, ইহা কেবল সহজজ্ঞানলব্ধ প্রতীতিকে দৃঢ় করে মাত্র, ইহা তাঁহারা বুঝেন না, সে দিকে তাঁহাদের চিন্তাই যায় না। যাহা হোক, তাঁহারা নানা দোষ দর্শাইয়া এই সকল প্রমাণকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিলেও, এ সকল চিরদিনই মানুষের সহজপ্রত্যয়কে দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়া আসিতেছে।

যে প্রমাণের কথা উপরে উক্ত হইয়াছে, তাহাকে সাধারণতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম—সৃষ্টিতত্ত্বমূলক (Cosmological, ২য়—অভিপ্রায়মূলক (Teleological), ৩য়—নীতিমূলক (Moral), ৪র্থ—পরমসত্তামূলক (Ontological) এবং ৫ম—সহজজ্ঞানতত্ত্বমূলক (Intuitive)। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ শাস্ত্রোক্তি হইতে আপন আপন বিশ্বাসের অনুযায়ী অনেকপ্রকার প্রমাণ সংকলন করেন। এই সকল

শাস্ত্রের অনেক প্রমাণ বিজ্ঞানসম্মত নহে এবং অন্ধবিশ্বাসসম্ভূত; সেজন্য তাহা আর উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

১ম—সৃষ্টিতত্ত্বমূলক :—

সৃষ্টিতত্ত্বমূলক প্রথমটীর বিষয় এখন অনুধাবন করা যাউক। বিশ্বসৃষ্টি দেখিলেই স্বভাবতঃ মন জানিতে উৎসুক হয় যে, কি প্রকারে এ বিশ্বের সমুদায়ের সত্তা সম্ভাবিত হইল এবং সমুদায় কি প্রকারে সংঘটিত হইল? এ সকলের হেতু কি? এই প্রকার আলোচনা করিতে করিতে, মানুষ ক্রমশঃই সৃষ্টিকর্ত্তার অনুমানে উপস্থিত হয়। এই কারণতত্ত্বকে মূল করিয়া বিচারবলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে গিয়া পৌঁছায়।

কোন একটী ঘটনা আমরা যখন দেখি, তখন আমাদের প্রকৃতি-নিহিত কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের অনুমান বশতঃ, আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, সে ঘটনা অবশ্যই কোন সমুচিত কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিশ্বাস মানুষের মনে অত্যন্তই প্রবল। এই প্রণালীতে পরিচালিত হইয়াই, মানবরাজ্যে সকলপ্রকার জ্ঞানতত্ত্ব ও বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে। মানুষের মনের মূলে এই বিশ্বাস না থাকিলে, যে সকল উন্নতি জগতে হইয়াছে, তাহার কোনটীরই সম্ভাবনা হইত না।

বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হইয়াই, বিশ্বরূপ যে সৃষ্টিকার্য্য, তাহার উপযুক্ত কারণানুসন্ধানে মানুষ প্রবৃত্ত হয়, এবং অনুসন্ধানের ফলে, একজন যে সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সৃষ্টির অগণনীয়তার মধ্যে আমাদের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ঘটনারাজি নিরন্তর ঘটিতেছে; জীব উঠিতেছে পড়িতেছে, জন্মিতেছে মরিতেছে,

কতশত উপদ্রব উৎপাত সমুত্থিত হইতেছে। আমাদের নিজ নিজ জীবনের মধ্যেই কত বিভিন্ন অবস্থা ঘটিতেছে, যাহাদের উপর আমাদের কোন হাত নাই ও যাহাকে বাধা দিবারও আমাদের শক্তি নাই। কোথা হইতে ও কেমন করিয়া এই সকল ঘটনা ও অবস্থা ঘটে, আমরা তাহার কারণ অনুসন্ধান করি, একটী কারণের পর আর একটী কারণ নির্দ্দেশ করি, পরিশেষে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের নিকট পৌঁছুছাই। তখনই মন তৃপ্তি লাভ করে। মানুষের প্রকৃতিই সহজজ্ঞানে এইরূপ এক পুরুষকে দেখে এবং এই সৃষ্টিতত্ত্বও তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করে এবং ইহা দ্বারায় মানুষের মন তুষ্ট হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, যখন অনুসন্ধান করিতে করিতে শেষ এমন একস্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, যেখানে গিয়া দেখা যায় যে, তাহার আর কোন কারণ নাই, তাহা অনাদি অঘটিত স্বয়ম্ভু, তাহা চিরদিনই আপনিই আছে, তখন কেন মনে না করা যাইবে যে, বিশ্বও সেইরূপ অনাদি স্বয়ম্ভুরূপে চিরকালই আছে, ইহার আবার কারণ আছে, কেন মনে করিব। ইহার উত্তর মানুষের অভিজ্ঞতা ও মনের প্রকৃতি আপনিই দিয়া থাকে। বিশ্বের বস্তুনিচয়সম্বন্ধে মানুষ কখনই এরূপ ধারণা করিতে পারে না। বিশ্বে জড়পদার্থ আছে ও অজড়ও আছে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আছে, জীবনযুক্ত ও জীবনহীন আছে, সমর্থ ও অসমর্থ আছে, কঠিন ও কোমল আছে, দুর্ব্বল ও বলিষ্ঠ আছে, এইরূপ নানা অবস্থার পদার্থ ও জীব ইত্যাদি আছে। সরল জ্ঞানবুদ্ধিতে মানুষ কখনই নির্দ্দেশ করিতে পারে না যে, এ সব আপনিই হইয়াছে, হইতেছে ও আপনা হইতেই আছে। এরূপ মনে করা প্রহেলিকা মাত্র। ইহা মানবপ্রকৃতির বিরুদ্ধ।

এক প্রকাণ্ড কোন বস্তুকে যদি মনে করা হয় যে, সে আপনিই রহিয়াছে ও তাহার মধ্যগত সকল বিষয় আপনি ঘটাইতেছে, তাহা হইলে এই বিশ্বসমষ্টি যেন এক প্রকাণ্ড যন্ত্রের মত হইয়া যায়; এবং ইহার ভিতর গভীর জ্ঞানচৈতন্যের কৌশলের কার্য্য দেখিলে মনে হয়, এই যন্ত্রটাই যেন তাহার মহাজ্ঞানেতে ও শক্তিতে আপনার সমস্ত আপনিই পরিচালিত করিতেছে। বস্তুতঃ ইহাকে তাহা হইলে এক সচেতন শক্তিশালী কর্ত্তা মনে করিতে হয়। প্রকারান্তরে ইহাকেই সেই অনাদি ও আপন স্থষ্টিকর্ত্তা মনে করিতে হয়। স্থতরাং একজন যে স্থষ্টিকর্ত্তা আছেন, প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইল। কিন্তু বিশ্বজগৎকে যত আমরা দেখিতেছি, ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যত ব্যবহার করিতেছি, ততই বুঝিতে পারিতেছি, বিশ্বজগৎ সেরূপ সামগ্রী নহে, কিম্বা হইতে পারে না। ইহাকে স্থষ্ট্যাদি কার্য্য করিবার উপযোগী চেতনাযুক্ত ও সর্ব্বশক্তিমত্তাযুক্ত মনে করা একেবারে অসম্ভব। সকল যুক্তিরই পরিসমাপ্তি ও তুষ্টি হয় সেইখানেই স্থষ্টিকর্ত্তাকে দেখিলে, যেখানে তাঁহাকে সহজজ্ঞান দেখাইয়া দেয়। অপিচ এই বিশ্বসমষ্টির স্বল্পাংশ আমরা নিজেরাই। বিশ্বজগৎ যদি সচেতন, সর্ব্বশক্তিমান্ ও স্বয়ম্ভু হয়, তাহা হইলে তাহার অংশরূপে আমরাও তদ্রূপ হইয়া যাই। কিন্তু আমরা স্পষ্টই বুঝি যে, আমরা স্থষ্ট বস্তু ও আমাদের একজন স্থষ্টিকর্ত্তা আছেন, যাঁহা হইতে আমরা পৃথক। তিনি শুদ্ধ, পবিত্র ও পূর্ণ, আর আমরা পাপের অধীন ও অপূর্ণ, ইহাও অনুভব করি। স্থতরাং বিশ্বজগৎকে স্বয়ং অনাদি, সচেতন, সর্ব্বশক্তিমান্, কার্য্যকারী কর্ত্তা মনে করা, সকল প্রকৃত বিচারজ্ঞান ও অনুভূতির বিরুদ্ধ। সহজজ্ঞান যেরূপে

সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখাইয়া দেয়, তাহাই প্রকৃত যুক্তির অনুমোদিত এবং সত্য।

যদি আমরা মনে করি যে, এ বিশ্বসৃষ্টি কেবল নিয়মে চলিতেছে, তাহা হইলে সে নিয়ম অন্ধনিয়ম হইলে, কোথা হইতে তাহা আসিল, ইহাই দেখিতে হয়। সে নিয়ম যিনি স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। যদি সেই নিয়মকেই সচেতন, স্বয়ম্ভূ ও সর্ব্বশক্তিমান্ মনে করি, তাহা হইলে প্রকারান্তরে সেই সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্বীকার করা হইল। অতএব সৃষ্টি দেখিয়া মানুষ অবশ্যই সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানিবে। ইহাই মনের প্রকৃতি।

ক্রমবিকাশের নিয়মে সৃষ্টির কার্য্য হইয়াছে বলিলেও, এ সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ ঘটে না। কারণ ক্রমবিকাশ একটী পন্থা মাত্র। যে পন্থায় পদার্থের সৃষ্টি হয়, পদার্থ সে পন্থা নিজে নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, বা কোথা হইতে সে পন্থা আইসে, তাহাও অবগত নহে। সুতরাং ক্রমবিকাশের নিয়ম অবস্থিত থাকিলে, সেই নিয়মের একজন প্রয়োগকর্ত্তা কেহ আছেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি—যাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে ক্রমবিকাশ ও তাহার নির্দ্দিষ্ট ফল হয়।

অতএব সকল দিক দিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, সৃষ্টির একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেনই আছেন। তাঁহার রচনা-কৌশল, তাঁহার বিচিত্র কার্য্যকলাপ, তাঁহার ব্যবস্থার পারিপাট্য, তাঁহার অপার শক্তি, তাঁহার অপার মহিমা, সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার চিত্তহারিণী মনোহর সৌন্দর্য্যরাজি, তাঁহার অনন্ত লীলা সকল দেখিয়া আমাদের মন বিহ্বল হইয়া পড়ে এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে চাহে এবং তাহাতে শান্তি ও প্রাণের শীতলতা প্রাপ্ত হয়

যখন মানুষের নিকট জ্ঞানজ্যোতিঃ তাদৃশ প্রখরভাবে প্রকাশ পায় নাই, তখন মানুষ সৃষ্টির খণ্ড খণ্ড অংশে ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টা ও পরিচালক আছে, কল্পনা করিত। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, তাহার আলোকে যতই মানুষ দেখিতেছে যে, সমস্তবিশ্বই এক অখণ্ড বিধি ব্যবস্থার অধীন, ততই ইহা প্রতিভাত হইতেছে যে, এ অংশভাব, এ খণ্ডভাব কেবল মানুষের দুর্ব্বল কল্পনার ফল। এইরূপে এক অখণ্ড সৃষ্টিকর্ত্তারই অনুভূতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। এই প্রকাণ্ড বিশ্ব হইতে বিশ্বকর্ত্তার অসীম অনন্তত্ব পূর্ণভাবে আয়ত্ত না হইলেও, ইহার বিশালতা হইতে বিশ্বকর্ত্তার অনন্তত্বের দিক নির্দ্ধারিত হয়, ইহা নিশ্চিতভাবে ও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

২য়—অভিপ্রায়মূলক :—

সৃষ্টির মধ্যে কত শতশতপ্রকার বস্তু দেখিলেই স্বতই মনে হয় যে, বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায়-সংসাধনের জন্যই, যেন এত বিভিন্নপ্রকার সৃষ্টি হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ও সেই সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে প্রসূত, যিনি এই অভিপ্রায়গুলি বুঝেন, এবং এই অভিপ্রায়-সাধনের জন্যই তাঁহার এ সব সৃষ্টি। এই অভিপ্রায় দেখিলে সেই অভিপ্রায়কারী স্রষ্টাকেই মনে হয়। এই অভিপ্রায় সেই স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ। এবং তিনি কিরূপ গুণের আধার, অনেকাংশে তাহাও প্রকাশ করিয়া দেয়। দেহস্থিত চক্ষুর গঠন দেখিলে কে না বুঝিতে পারে যে, চক্ষু বাহিরের আলোক দেখিবার জন্যই। মাতার দেহে স্তন্যদুগ্ধ ও শিশুর দন্তহীন মুখে ক্ষুধার তাড়নায় চুষিবার শক্তি যে কি অভিপ্রায়ে অবস্থিত, ইহা আর

কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। এইরূপ সৃষ্টির মধ্যে কত শত বস্তু পরস্পরের উপযোগিরূপে রহিয়াছে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এক একের সঙ্গে সংযুক্ত নহে, অথচ পরস্পরের উপযোগিতা তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান। যিনি এইরূপ করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় এই সকলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। দুইটী বস্তু পৃথক্ পৃথক্, অথচ কেন এই ভাবে ইহারা সংগঠিত ? অবশ্য যিনি এ সব রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় ইহাদের দ্বারা সংসাধিত হইবার জন্যই এরূপ হইয়াছে। বলিহারি তাঁহারে! এইরূপে সৃষ্টির মধ্যে অগণ্য অগণ্য পদার্থ-সকল দেখিয়া আমাদের মন চমকিত হয়। জ্ঞানের যতই স্ফুরণ হইতেছে, ততই সৃষ্টবস্তু-সকলের মধ্যে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা, তাঁহার কৌশল-সমূহ এবং তাঁহার কল্যাণ-সাধনের ব্যবস্থা সকল প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ইহাতেই তাঁহার অস্তিত্ব, গুণপণা ও প্রেম সমগ্ররূপে প্রমাণিত হইতেছে। মানবহৃদয় এই সব অনুভব করিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়ে।

কখন কখন এরূপ যুক্তি উপস্থিত করা হয় যে, সৃষ্টির মধ্যে এক বস্তুর সঙ্গে আর এক বস্তুর মিলন ও সহযোগিতা ক্রমশঃ অভ্যাস বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে কাহারও অভিপ্রায় সন্নিবিষ্ট নাই। ঘটনাচক্রে সেই সব বস্তু কোন সময়ে সম্মিলিত হইয়াছিল ও ক্রমে বারম্বার সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহাতে উহাদের বারম্বার সম্মিলনে উহাদের মধ্যে যোগ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে ও সামঞ্জস্য আসিয়াছে, যাহা দেখিয়া আমরা এখন উহা অভিপ্রায়-নিঃসৃত সামঞ্জস্য বলিতেছি; কিন্তু এখানে কোন অভিপ্রায় নাই, কেবল

ঘটনার সংযোজন ও অভ্যাসমাত্র এবং তাহারই ফল। এ যুক্তি শুনিতে বেশ রহস্যজনক বোধ হয়, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে ইহা অদ্ভুত ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। সৃষ্টিতে এরূপ সংযোজনও আছে; যেখানে নানা পদার্থ, সেখানে একপ্রকার আকস্মিক সম্মিলন না থাকাই অসম্ভব। কিন্তু তাহা বলিয়া যেখানে পরিষ্কার অভিপ্রায়জাত যোগ, তাহার তত্ত্ব ইহাতে প্রকাশিত হয় না। জল পড়িতে পড়িতে পাথর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, হয়ত তাহাতে গর্ত্ত হইয়া জল দাঁড়াইবার স্থান হয়। ইহা আকস্মিক সম্মিলনের ফল। কিন্তু চক্ষু ও আলোকের কি সেইরূপ সম্বন্ধ, কর্ণ ও শব্দের কি তদ্রূপ সম্বন্ধ বলা যায়? এরূপ সম্বন্ধ যে সহস্র সহস্র প্রকার সৃষ্টির মধ্যে বর্ত্তমান, যাহা পরিষ্কার অভিপ্রায়-সম্ভূত ছাড়া হইতে পারে না। তাহা ছাড়া জীব-দেহ-গঠনের এমন সব সামগ্রী আছে, যাহা বরং সংযোজনা ও অভ্যাসের বিরোধী—দেখিলেই বোঝা যায় যে, সেই স্থানীয় সংযোজনার ফলকে সংরুদ্ধ করিবার জন্য তাহার সৃষ্টি হইয়াছে—তাহা না হইলে সে সংযোজনা হইতে অনিষ্টকর ফল হইত। জীব-হৃদয়ে (heart) রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে। একটী আধার হইতে রক্ত অন্য আধারে যায়—তাহার মধ্যে কপাটবৎ ব্যবস্থা (valve) আছে, ঐ কপাট রক্ত যাইবার সময় খুলিয়া যায়—কিন্তু সে রক্ত যেমন যায়, তেমনি বাহির হইয়া আসিতেও পারে। সামান্য সংযোজনায় এইরূপই হইবে; কিন্তু তাহা হইলে রক্ত-সঞ্চালন-কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে। এ জন্য এস্থলে সে রক্তের বাহির হইয়া আসাকে বাধা দেওয়া প্রয়োজন। এই অভিপ্রায়ে সে কপাটের গঠন এরূপ যে, রক্ত যাইবার সময় খুলিয়া

যায় ; কিন্তু বাহির হইতে গেলেই আপনি বন্ধ হইয়া যায়। হাতের কব্জির শিরাগুলি লম্বা লম্বা। যদি সবগুলি কেবল ঐরূপ থাকে, (এবং আপনার সহজ অভ্যাস বশতঃ ঐরূপ থাকিবেই) তাহা হইলে হাতের কব্জি সরু হয় না ও কার্য্যক্ষম হয় না। এই জন্য বেশ বুঝা যায় যে, এই অভিপ্রায়েই ঐখানে একটী গোল কফনি দিবার জন্য এক গোলাকার বন্ধনী শিরার সৃজন হইয়াছে, যাহা ঐ সকল শিরাগুলিকে চাপিয়া বাঁধিয়া সরু ও কার্য্যক্ষম করিয়া রাখে। পায়ের কব্জিরও ঐরূপ ব্যবস্থা। এই সকলই প্রত্যক্ষ অভিপ্রায় প্রকাশ করে। ইহাতে মনে কোনই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারেনা। এইরূপে কত শত সহস্র প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়-প্রকাশের ব্যবস্থা রহিয়াছে, যাহা দেখিলে হৃদয় চমকিত হয় ও করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি মন বিগলিত হইয়া ধাবিত হয়। সমস্ত সৃষ্টিময় জীবোৎপত্তির যে ব্যবস্থা—জীবাণু বলি, জীবশিশু বলি, গাছের অঙ্কুর বলি, ফল বলি—ইহার ভিতরে কি আশ্চর্য্য অভিপ্রায় ও কৌশল রহিয়াছে। কে এই সকল দেখিয়াও সৃষ্টির মধ্যে এক মহা অভিপ্রায়ের অবস্থিতি অস্বীকার করিতে পারে? এই অভিপ্রায়ই অভিপ্রায়-কর্ত্তাকে দেখাইয়া দেয় ও তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা উচ্চরবে প্রকাশ করে। অনেক স্থলে অবশ্য অনন্ত সৃষ্টিকর্ত্তার পূর্ণ অভিপ্রায় ক্ষুদ্র মনুষ্যের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। মানব নিজ কল্পনাদ্বারা যাহা তাহা ভাবে এবং সে জন্য দুঃখ পায়। হয়ত বিধাতাকে নিন্দাও করে; কিন্তু যখন পরিণামে সে অভি-প্রায় প্রকাশিত হয়, তখন আর অসন্তোষের কারণ দেখা যায় না। এমন কি, মৃত্যুকেও মঙ্গলের সোপান বলিয়া সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভগবানের অভিপ্রায় সৃষ্টির মধ্যে, সকল ঘটনার মধ্যে প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে, সে অভিপ্রায় যে মঙ্গল প্রসব করে, ইহা আর জানিতে বাকী থাকে না। মহান্ অনন্তের অভিপ্রায় ক্ষুদ্রের পক্ষে সর্ব্বথা বুঝা কঠিন হইলেও, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। এই জন্যই সৃষ্টির মধ্যে অভিপ্রায় দর্শন করিয়া, সহজেই আমরা স্বীকার করি ও বলি যে, একজন অভিপ্রায়কারী সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন।

৩য়—নীতিমূলক :—

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণসমুদায় বিশ্বসৃষ্টি-সম্পর্কীয়। এই তৃতীয় প্রমাণ কেবল মানবপ্রকৃতি ও মানবরাজ্য হইতে সমুদ্ভূত। এ জগতে মানবেরই কেবল প্রকৃতপক্ষে নীতিজ্ঞান আছে, দেখা যায়। মানুষই কেবল ধর্ম্মরাজ্যে অবস্থিত। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই নীতি-জ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞান মানুষ কোথা হইতে পাইল? এই বিষয় লইয়া নীতিবিজ্ঞানে ও শাস্ত্রে তুমুল আলোচনা হইয়াছে। এক একজন পণ্ডিত এক এক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, নীতিজ্ঞান মানববংশ হইতে মানবের কার্য্য দ্বারাই সমুদ্ভূত। নীতিজ্ঞানের মূলে মানুষের এক দায়িত্বজ্ঞান বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহা করা উচিত, তাহা করিতে মানুষ বাধ্য। তাহা পালন করার জন্য মানুষ দায়ী। এই যে দায়িত্ব, বা বাধ্যতাভাব কোথা হইতে আসিল? এক রকম কার্য্যকে আমরা অনেক সময় উচিত বলি, যাহার মধ্যে এ প্রকার বাধ্যতাভাব অনুভব করা যায় না। যেমন ঘরের জানালা খোলা উচিত, কেননা,

তাহা হইলে ঘরের মধ্যে আলোক বাতাস আসিতে পারিবে এবং ঘরটা গরম হইবে না। এখানে সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতা হইবে, সেই জন্য উচিত বলা হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উচিত সেইখানেই বলা যায়, যেখানে যে কাজ না করিলে দোষ হয়, অপরাধ হয়; এবং সেই-রূপ কাজ করিতেই আমরা যেন আপনাদের বাধ্য মনে করি—কে যেন সে স্থলে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে, যাঁহার আদেশ মান্য করা ও শুনিয়া চলা আমাদের চাই—না শুনিলে আমাদের দোষ হয়, ত্রুটী হয়, এইরূপ মনে হয়। এখানে ঐ কাজ করিতে আমরা বাধ্য। আমরা মনে করি যে, তাহাতেই আমাদের প্রকৃত ইষ্ট আছে, না করিলেই অনিষ্ট। এই যে বাধ্যভাব, দায়িত্ব-জ্ঞান কোথা হইতে আইসে? মানুষের মধ্যে বিবেক-শক্তি আছে, যাহা অন্য জীবের মধ্যে নাই। সেই বিবেকই এই দায়িত্বজ্ঞান, বাধ্যতার ভাব আমাদের মধ্যে উদ্রেক করে। বিবেক বলে—সত্যকথা বলিবে—সত্য ব্যবহার করিবে। বিবেক বলে—ন্যায় ব্যবহার করিবে—যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে দিবে। বিবেকের কথার আমাদের উপর যেন একটা জোর আছে ও যেন বল প্রকাশ করে। এই বল বা জোর আমাদের অবশ্য নিজেদের নহে। আমাদের উপর এমন কেহ আছেন, যাঁহার নিকট হইতে এই বল ও জোর আসিতেছে—তিনিই এহ বিবেকদ্বারা আমাদের আদেশ করেন এবং আমরা সেই আদেশ মানি। ইহাতেই বুঝা যায় যে, মানুষের প্রকৃতি এইভাবে গঠিত হইয়াছে, যদ্দারা স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, মানুষের উপর এমন একজন উপরওয়ালা আছেন, যিনি মানুষকে এইভাবে সৃজন করিয়াছেন। এই কর্তৃত্ব-প্রকাশ

তাঁহারই, তিনিই বিবেক দ্বারা আমাদিগকে আদেশ করেন ও আমরা তাহা পালন করি। ইহাতেই একজন ন্যায়বান্, ধর্ম্মরাজ সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা যে আছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নীতিজ্ঞানকে কোন কোন পণ্ডিত মানববংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়াছেন। তাঁহারা মানবের কার্য্যকলাপ হইতেই ইহার উৎপত্তি প্রমাণ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন যে, মানুষের সুখ, সুবিধা, আরাম, আনন্দের আকাঙ্ক্ষা বড় প্রবল, সেজন্য নিজ স্বার্থের অনুরোধে ঐ সব কাজ করা উচিত মনে করে; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে অনেক সময় মানুষ নিজ স্বার্থকেও বিসর্জ্জন দিয়া এ সব কাজ করিতে প্রবলভাবে অগ্রসর হয়, এবং অনেক সময় নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করে ও অক্লেশে জীবন দান করে, এবং সে কার্য্যকে সে নিজে ও সাধারণে গৌরবের মনে করে। কেবল সুখ স্বার্থ যদি মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইত, তাহা হইলে এরূপ ভাব, এরূপ জীবন-দান কখনই হইতে পারিত না। অপিচ দেখা যায়, কেহ নিজ স্বার্থ সুখের জন্য কোন কাজ করিলে, লোকে তাহাকে নিন্দা করে, স্বার্থপর বলে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, অবশ্য নিজের সুখ স্বার্থের জন্য কোন কাজ করিলে তাহাতে উচিত কাজ করা হয় না—সে কাজকে উচিত কাজ বলা যায় না এবং সেরূপ কাজ করিতে আমরা নিজেদের বাধ্য মনে করি না; কিন্তু উচিত কাজ তাহাই, যাহাতে দশজনের, সাধারণের সুখ সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য ও উপকার হয়। এখানেও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, দশজনের সুখ সুবিধা খোঁজায় আমাদের কি কাজ—আমরা তাহা করিতে আমাদের কেনইবা

বাধ্য মনে করি? এখানেও কি বিবেকের শাসন নহে? যদি বলা যায় যে, দশজনের দিক না দেখিলে দশজনও আমার দিক দেখিবেন না, এবং তাহাতে আমার ক্ষতি হইবে, সেই জন্য আমি দশজনের দিক দেখিতে বাধ্য। কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে, দশজনে আমার কাজ টেরই পাইল না; তাহা হইলে আমার সে কাজ করার কোন কারণই থাকিল না। অর্থাৎ লোকের অগোচরে কাজ করিলে, সেখানে আর উচিত অনুচিতের কথা থাকিল না। বস্তুতঃ কেহ দেখুক, আর না দেখুক, যাহা উচিত, মানুষ তাহা সততই উচিত মনে করে। দ্বিতীয় কথা এই যে, দশজনের কিসে ভাল হইবে, কি না হইবে, তাহা ভাবিয়া কে স্থির করিতে পারে বা বুঝিতে পারে—আর কয়জনইবা সত্য সত্যই কাজ করিবার সময় এরূপ ভাবে? সকলেই এরূপ ভাবনাদি না করিয়াও, কোন্ কার্য্য উচিত, ইহা বুঝে, আর তাহা করে। প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ স্থলে—এ উচিত, কি অনুচিত—এ দায়িত্বের অনুভব বিচারবুদ্ধির দ্বারা বুঝার উপর নির্ভর করে না। স্বভাবতঃই মানুষ তাহা বুঝিয়া ফেলে। যেখানে কোন সন্দেহ মনে উপস্থিত হয়, তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা মীমাংসা করে। যে কার্য্য বিবেক নির্দ্দেশ করে, অর্থাৎ যাহা করিবার আদেশ উপর হইতে আইসে, সে কার্য্য কখনই দশজনের অনিষ্টের কারণ হইতে পারে না। এই জন্যই এই কষ্টিপাথর কাজকে পরীক্ষা করিতে চাহে। দেখিতে চাহে, এ কাজ দ্বারা দশজনের উপকার হইবে কিনা। অন্যত্র সর্ব্বদাই মানুষ যাহা বিবেকের বাণী দ্বারা শুনে, তাহাই উচিত মনে করে। এই বাণী তাহার নিকট প্রবলবেগে ও আজ্ঞাপক রূপে

আইসে, এবং মানুষ তাহা পালন করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করে।

নীতি-বিজ্ঞান মধ্যে এমন অনেক আলোচনা আছে, যাহা উপযুক্ত ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, মানুষের বিবেকের একটা কর্ত্তৃত্ব ও শাসন আছে, যাহা মানুষের মধ্য হইতে আইসে; অবশ্য মানুষের প্রকৃতির উপরিস্থ কোন স্থান হইতে উহা উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতিতে সংলগ্ন হয়। যেখান হইতে ইহার উৎপত্তি, তাহার মানুষের উপর প্রভুত্ব করিবার, আদেশ করিবার প্রভৃত ক্ষমতা আছে—এবং যাহা সত্যভাবে, ন্যায়ের ভাবে, প্রেমের ভাবে, পুণ্যের ভাবে মহা বলবান্। ইনিই ধর্ম্মরাজ্যের রাজা এবং ইনিই মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা। মানুষ যে আধিপত্যের ভাব, বাধ্যকারী ভাব অনুভব করে, তাহা এই ধর্ম্মাধিরাজ হইতে আইসে বলিয়া। এই কর্ত্তৃত্ব ও আধিপত্য লইয়া ন্যায় ধর্ম্ম মানুষেয় নিকট আসাতেই প্রমাণিত হয় যে, একজন ন্যায়বান্ ও ধর্ম্মবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। অর্থাৎ যিনি মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা ও তাহার প্রকৃতির ও গঠনের মূলে যিনি অবস্থিত, তিনি স্বয়ং ন্যায়বান্ ও ধর্ম্মরাজ। নীতিতত্ত্বমূলক প্রমাণ হইতে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই। নতুবা নীতির আধিপত্য এবং ধর্ম্মের ও ধর্ম্মরাজ্যের শাসন অন্য কোনরূপে মনুষ্য-বংশে আসা সম্ভব নহে।

৪র্থ—পরমসত্তামূলক প্রমাণ:—

সকল পদার্থের মধ্যে আবার অন্তর্নিহিত সত্তার অবস্থিতি আমরা অনুভব করি, বুঝিতে পারি। সেই বস্তুই অবস্থিত ও তাহাই

নিজগুণে প্রকাশিত হয়—ইহাই যেন সে পদার্থের নিগূঢ় আত্মা, নিগূঢ় অন্তরস্থ সামগ্রী। যেমন কোন বস্তু কালবর্ণবিশিষ্ট কিম্বা সাদা-বর্ণবিশিষ্ট। সেই কাল বা সাদা রং, সাদা বা কাল রংএ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; কিন্তু সে জন্য প্রকৃতপক্ষে পদার্থের পরিবর্ত্তন ঘটে না; আসল বস্তু আসলই থাকে, রংএর পরিবর্ত্তন হয় মাত্র—বস্তুর সত্তা (সত্ত্ব) থাকিয়া যায়। একই মানুষ এক সময়ে প্রেমে গদগদ, অপর সময়ে ক্রোধান্ধ হয়; কিন্তু সে মানুষ সেই মানুষই থাকে। এই নিগূঢ় আত্মতত্ত্বকে মূল করিয়া, বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, আমরা ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণে উপনীত হই।

জনৈক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ বিষয়ে বলিয়াছিলেন যে, "Cogito ergo sum"—আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি, অর্থাৎ আমি জানিতেছি, বুঝিতেছি যে, আমি চিন্তা করিতেছি—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আমার চিন্তা করা আমি করিতেছি, জানিতেছি, পরিষ্কার বুঝিতেছি। যখন আমি এরূপ বুঝিতেছি, তখন আমি বলিয়া কোন পদার্থ মূলে না থাকিলে, এ সব কি করিয়া সম্ভব হয়? সুতরাং এই সব কার্য্য হইতেই স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, আমি এক পদার্থ আছি। আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, যেখানে কিছুই নাই, সেখানে কোনও ফলও নাই ও হয় না (Nothing comes out of nothing)। চিন্তা আছে, সুতরাং কোন কিছু হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে—সেই কিছু, যাহাতে এই চিন্তা সংলগ্ন, তাহাই আমি। সেইরূপ জগৎ—এই বিশ্বসংসার—এক মহা চলনশীল ঘটনা—ঘটিতেছে, চলিতেছে, প্রবাহিত হইতেছে—ইহা অবশ্যই কোনও নিত্য স্থির পদার্থে সংলগ্ন

ও অবস্থিত। সেই পদার্থই ব্রহ্ম। যেমন কিছু না থাকিলে কিছুই হয় না, সেইরূপ এমন এক পদার্থ—ব্রহ্ম—না থাকিলে এ সৃষ্টিই হইতে পারে না। এইরূপ বিচার এ প্রমাণের অন্তর্গত।

ইহাতে সৃষ্টিকে এক প্রকার সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক ইহা তাঁহারই গুণপ্রকাশ বটে (manifestation)। ইহার যাহা কিছু বিধি ব্যবস্থা প্রকাশ, সমস্তই তাঁহার প্রকাশ বটে; কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের চারিদিকের অবস্থিত বিষয় সকলে আমরা যেমন দেখিতে পাই যে, সে গুণ আর সে বস্তু এক,—বস্তুতঃ গুণরূপে প্রকাশিত; এই সৃষ্টিসম্বন্ধে সে কথা ঠিক বলা যায় না। ইহা স্রষ্টারই গুণ-প্রকাশ বটে, কিন্তু তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র। এইরূপ করাতেই সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্তশক্তি ও অসীম কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে। সৃষ্ট ও স্রষ্টা যে এক নহে, তাহা আমরা নিজ নিজ জীবনে বিশেষ উপলব্ধি করি। আমরা বেশ বুঝি যে, আমরা ক্ষুদ্র, আমরা মোহের অধীন, পাপের অধীন, অজ্ঞান, অপবিত্র ও অপূর্ণ; অন্যদিকে সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্ত মহান্ অসীম, চৈতন্যপূর্ণ, জ্ঞানময়, পুণ্যময়, নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র-স্বরূপ। আমরা তাঁহার পূজা করি, বন্দনা করি, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি; তিনি আমাদের বল দেন, মুক্তি দেন, পরিত্রাণ দেন। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমরা অর্থাৎ সৃষ্টবস্তু-সকল তাঁহা হইতে অবশ্যই পৃথক্। সুতরাং অদ্বৈতবাদের মত আর তিষ্ঠিতে পারে না, অথচ সৃষ্ট হইতেই, অর্থাৎ সৃষ্টরূপ গুণপ্রকাশ হইতেই—সেই স্রষ্টাই যে প্রকৃত বস্তু, যাহা না থাকিলে এ সৃষ্টি থাকা সম্ভবই হয় না—তাহাই প্রমাণিত হয়। এই প্রমাণ হইতে আমরা বলি যে,

স্রষ্টাই সার, আমরা সব অসার। তিনি আদি জ্যোতিঃ, আমরা অজ্ঞান আঁধার।

৫ম—সহজজ্ঞানতত্ত্বমূলক :—

এই প্রমাণের বর্ণনা পূর্ব্বেই যথেষ্ট করা হইয়াছে, এখন আর বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। বিধাতা মনুষ্য-প্রকৃতির ভিতর বিশেষ শক্তি দিয়াছেন, যাহা দ্বারা মানুষ তাঁহার উপযুক্ত পরিচয় পায়, যে শক্তির নিকট তিনি নিজে প্রকাশিত হইয়া নিজ পরিচয় দেন। ইহাতেই মানুষ তাঁহাকে মানবোচিত সম্যক্‌রূপে অসীম অনন্তভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। ইহা প্রকৃত প্রমাণ নহে, ইহা দর্শন। পূর্ব্বের চারিটী বিচারযুক্ত প্রমাণ ; এই পঞ্চম প্রমাণটী সেরূপ নহে, বিচারযুক্তি দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন নহে। ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। এই উপলব্ধি বিধাতার কৃপায় যখন ঘনীভূত হয়, তখন সাধুজন, বিশ্বাসিজন অতি প্রগাঢ়রূপে ঈশ্বরকে দেখেন। আবার ঈশ্বর স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া সাধকের নিকট বিবিধ প্রকারে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, এবং মানবেতিহাসে মহাত্মা মহাজনগণ তাঁহারই বিধানে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহার পরিচয় উজ্জ্বলরূপে ব্যক্ত করেন। এইরূপ নানাপ্রকার উপায় দ্বারা মনুষ্য ব্রহ্মদর্শন করিয়া চরিতার্থ হয়।

ধর্ম্মের বিভিন্ন প্রকার ও সম্প্রদায়

সহজজ্ঞানে মানুষ ব্রহ্মোপলব্ধির আভাস পায়। তাহাতেই ব্রহ্মকে পরিষ্কাররূপে জানিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হয় এবং মানুষ তাহার সমস্তশক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা করে। দেশে দেশে, কালে কালে মানুষের এই চেষ্টাই চলিয়া আসিতেছে। ফলে যেখানকার মানুষ যেমন, যে মানুষ যেমন, সেখানে সেই মানুষ ঈশ্বরকে সেই ভাবেই নিজ নিজ ধারণায় কল্পিত করিয়াছে। ঈশ্বর-সম্বন্ধে ধারণা এই প্রকারে বিভিন্ন প্রকার হইয়া উঠিয়াছে। দেশে দেশে, কালে কালে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ধর্ম্মের রূপ ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। এবং এক এক বার এক এক আকারে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করায়, তাহার অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ, সে সব লোকেদের চিন্তা, ভাব, গতি, অভ্যাস ও প্রবৃত্তি বিভিন্ন আকারে গঠিত হইয়া, বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়া গিয়াছে। পরিণামে এরূপ হইয়াছে যে, যদিও সকলেই একই উদ্দেশে, একই ঈশ্বর-দর্শন উদ্দেশে অনুধাবন করিয়াছিলেন, তথাপি সকলেই পরস্পরের বিরোধী শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ফলে বর্ত্তমানে জগতে নানা ধর্ম্ম, নানা সম্প্রদায়, এক অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই ইহার ফলে পৃথিবীতে কতই রক্তপাত, হত্যা ও উপদ্রবই হইয়া গিয়াছে এবং পৃথিবী দুঃখের আগার হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের মনের উন্নতি যেমন, সেইরূপ ভাবেই ঈশ্বর-বিষয়ক উপলব্ধি লাভ হয় এবং তাহার মন, চিন্তা, বিচার, কল্পনা ও ভাব সমস্তই সেইরূপ ভাবেই

সহায়তা করিয়া থাকে। বালক যদি কোন মহৎ বিষয় চিন্তা করে, সে বালকের ভাবেই করে। তাহার মনের দৌড় তো তাহার শক্তিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। সংসারী লোকের চিন্তা সংসারীরই মত। এই প্রকারই সকল প্রকার অবস্থার লোকের, সকল প্রকার মানুষের চিন্তা নিজ নিজ অবস্থার অনুযায়ী হইয়া থাকে। চিন্তাকে ভাল করিতে গেলে, প্রথমে সে মানুষের অবস্থাকে, মনকে সমুন্নত করিতে হইবে; তবে ক্রমে তাহার চিন্তা উন্নত ও সঙ্গত হইবে। যে সকল জাতি এখনও তাদৃশ উন্নতিলাভ করে নাই, অথবা অসভ্য অবস্থায় আছে, তাহাদের চিন্তাও সমুন্নত হয় নাই। সুতরাং তাহাদের ঈশ্বর-বিষয়ক ভাবও অনুন্নত, অসঙ্গত, অপরিষ্কৃত ও গোলমেলে। কেহ কেহ মনে করে যে, তিনি আছেন বটে, কিন্তু তিনি কোন প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে আছেন, কিম্বা কোন পুরাতন বৃক্ষের মধ্যে আছেন। তাহারা তাহাই বুঝিয়া, সেই সব স্থলে সিন্দুরাদি লেপন করে, পুষ্পমালা দান করে, সেই স্থানকে পূজা করে। ছাগ বলি দেয়, অন্য জীব বলি দেয়। এমন কি, নরবলিও কিছুকাল অগ্রে প্রচলিত ছিল। এ প্রথা বর্ত্তমান রাজশাসনে প্রায় নিবারিত হইয়াছে। এই সকল জাতির ধারণা এই যে, যিনি সর্ব্বোচ্চ, তিনি এই ভাবে পূজা ও বলি না পাইলে রুষ্ট হইবেন, এবং অনিষ্ট ঘটাইবেন। তাহারা বলে যে, ঈশ্বর সকল স্থানে আছেন এবং সে জন্য এই প্রস্তর ও বৃক্ষেও আছেন। তাঁহার সম্মুখে এইরূপ বলি না দিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হন। এরূপ চিন্তা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ধর্ম্মভাবের এই এক আকার ও অবস্থা। ভারতে এইরূপে ধর্ম্মের কতপ্রকার আকার ও কতপ্রকার সম্প্রদায় আছে,

তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। হিন্দুসম্প্রদায় এক প্রকাণ্ড সম্প্রদায়। তৎপরে মুসলমান সম্প্রদায় ও অধুনাতন খৃষ্টীয় সম্প্রদায় আসিয়া পড়িয়াছে। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় জন্মিয়াছে; ইহাদের নিম্নস্তরে অসভ্য বন্য জাতির আচার, পূজাবিধি ও দেবতা স্থান পাইয়াছে। এইরূপে ধর্ম্মের ভাব ও ধারণা অসংখ্য হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের মনের উন্নত অবস্থা বা অবনত অবস্থার উপর এ সকলই নির্ভর করে, আর সে উন্নতি ও অবনতি লক্ষ লক্ষ প্রকারের। মানুষের সহজজ্ঞানের আভাসের সঙ্গে এইরূপ অবস্থার বৈচিত্র্য উহার একটী কারণ বলা যাইতে পারে।

হিন্দুধর্ম্মে ভগবানের ব্যাপিত্ব-বিষয়ক উপলব্ধি প্রধান বলিয়া মনে হয়। ভগবান্ আছেন ও সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপিরূপে আছেন, এই ভাব এ ধর্ম্মে প্রবল বলিয়া মনে হয়। অন্যভাবও অবশ্যই আছে, কিন্তু এইটী যেন বিশেষরূপে হিন্দুর মনকে আকৃষ্ট করে। সুতরাং হিন্দু তাঁহাকে জলে, স্থলে, আকাশে, অন্তরে, বাহিরে প্রবলভাবে দেখিতে চেষ্টা করে। গায়ত্রী-মন্ত্রের এক প্রধান অংশ—"ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এবং সকল মন্ত্রের পূর্ব্বেই "ওম্"। এই জন্যই ইহা যোগপ্রধান ধর্ম্ম। যোগ দ্বারা যোগী তাঁহাকে আত্মস্থ উপলব্ধি করিতে ব্যস্ত। তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া ধ্যানী জীবন অতিপাত করেন। কত শতশত যোগী অরণ্যের মধ্যে ধ্যানে মগ্ন হইয়া নিশ্চল নিস্পন্দভাবে মৃতপ্রায় কালযাপন করিতেন এবং হয়ত এখনও করিতেছেন। এই যোগেরও আবার কত বিভিন্ন ধারা। আবার অন্যদিকে বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি কত কত সম্প্রদায়।

নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে ও ভাবে সকলেই সেই সর্ব্বব্যাপীকে আয়ত্ত করিতে ধাবমান। কিন্তু কেবল যোগেতেই মানুষের তৃপ্তি হয় না। ইহাতে অনেক সময় জ্ঞানের শুষ্কতা আনয়ন করে। সুতরাং ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভক্তির স্রোত উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ সংমিশ্রণে ধর্ম্মের নানা আকার-প্রাপ্তি হইয়াছে। ভক্তির উদ্দীপনে সাহায্য করিবে বলিয়া নানা মূর্ত্তি কল্পিত হইল; এবং এই মূর্ত্তি-কল্পনায় ও তাহার পূজায় পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইল। ভগবানের ব্যাপিত্ব অবলম্বন করিয়া, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে তাঁহার বিভিন্ন গুণচয় উপলব্ধ হইতে লাগিল; এবং সেই সমস্ত গুণই যেন জীবন্ত পৃথক্ ভাবে অবস্থিত ভাবিয়া, ক্রমে ঐ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থই ভক্তির সামগ্রী হইয়া উঠিল। অগ্নিপূজা, সূর্য্যপূজা, বরুণপূজা, ইন্দ্রপূজা, পবনপূজা, ব্রহ্মার পূজা, শিবপূজা, যম(মৃত্যু)পূজা, এইরূপে নানা দেবতার পূজা আরম্ভ হইল। এই দেবতার মধ্যে কাহাকেও সাধারণ দৃষ্টিতে বাদ দেওয়া যায় না, সেজন্য দেবভূমি, কল্পিত-স্বর্গ বহুদেবতায় পূর্ণ হইল। পরে শীতলা, ধর্ম্ম, ওলাবিবি প্রভৃতি বহুতর নিম্নশ্রেণীর দেবতাও আসিয়া জুটিল। কিন্তু সহজজ্ঞান অনন্তরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করায়; সেইজন্য এই অগণ্য কাল্পনিক দেবমণ্ডলীর মধ্যেও, মনুষ্য-হৃদয় কোন একটীকে প্রধান বলিয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, অন্য সকল দেবতাকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থান প্রদান করে। এইরূপে হিন্দুধর্ম্মের আয়তন সংগঠিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এই ধর্ম্মকে সংস্কার করিবার জন্য, পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীরাদির অভ্যুদয় হইয়াছে। পরে আবার গুরুনানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য, তুকারাম,

শঙ্কর, কত কত ভক্তিভাজন সংস্কারক জগতে আসিয়া, ধর্ম্মজীবনকে গভীরতার দিকে লইয়া গিয়াছেন। আবার অন্যদিকে অরণ্যবাসী, মহাজ্ঞানী, ঋষিতপস্বীরা সেই প্রকৃত ব্রহ্মসনাতনের যথার্থ উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাদের লব্ধ তত্ত্বের দ্বারা, ভারতকে মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত ও উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম হইতেই ভারতে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা প্রবল বলিয়াই, ভারতে ধর্ম্মের সুগভীর তত্ত্বসকল প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালেও রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পরমহংস রামকৃষ্ণ ইত্যাদি মহাপুরুষগণ এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই শুদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইযাছে। এ সকলের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের, বিশেষ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন আকার প্রকাশ পাইয়াছে।

আর্য্যজাতির মধ্যে ধর্ম্মের আকার এইরূপে প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু "সেমেটিক" (Semitic) জাতির মধ্যে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। আরবদেশে তাঁহাদের প্রধান বাসস্থান, সে দেশে ভগবানের ব্যাপিত্ব অপেক্ষা ব্যক্তিত্বের দিক বেশী প্রবল। তিনি একজন প্রভু, রাজা। স্বর্গেতে তিনি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট; স্বর্গীয় দূতেরা তাঁহার পরিচর্য্যা করে। তাঁহার প্রতাপে সমস্ত বিশ্বসংসার কম্পিত। এ দেশের ধর্ম্মে এই ভাব প্রবল। মহম্মদীয়েরা "আল্লা হো আকবর" অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এইভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া একেবারে প্রমত্ত। তাঁহাদের পার্শ্বস্থ দেশবাসীদের মধ্যে পৌত্তলিক পূজার প্রথা ছিল। সেই পৌত্তলিকতার উপর য়ুডিয়াবাসী ইহুদীরা ও মুসলমানেরা মহা খড়্গহস্ত ছিলেন। ভগবানের সম্মুখে

অন্য দেবতার পূজা তাঁহাদের চক্ষে মহাপরাধ, মহাপাপ। কাফের অর্থাৎ অবিশ্বাসীর জীবন মহা অনিষ্টের কারণ। সেই অনিষ্টের কারণ অপনীত করা একটী ভালবাসার কার্য্য মনে করা হইত। বর্ত্তমানে সে সব দেশ মহম্মদীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহুদীদিগের ও মুসলমানদের ধর্ম্মে একেশ্বরবাদ রহিয়াছে। তাহাতে বহুদেবতার পূজা নাই, পৌত্তলিকতা নাই। কিন্তু একই ভাবের উপর বিশেষ প্রবল আধিপত্য প্রদান করায়, ঠিক উপযুক্তভাবে ধর্ম্ম আসিতে পারে নাই। সকলদিকে পরিপুষ্টি লাভ হয় নাই, ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থলে প্রকারান্তরে পৌত্তলিকতা কালক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম জুডিয়াতে মহাত্মা ঈশা হইতে সমুত্থিত। "ত্রিনিতিবাদী" (Trinity) খৃষ্টিয়ানদের মধ্যেও (রোমান ক্যাথলিক ও অন্যান্য খৃষ্টীয়ানদের মধ্যে) একপ্রকার পৌত্তলিকতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনেক উৎকৃষ্টভাবের সঙ্গে অনেক কুসংস্কার মিশিয়া গিয়াছে। অনেক উন্নত উদারচেতা খৃষ্টীয়ানেরা এখন ক্রমে "ত্রিনিতি" মত বর্জ্জন করিয়া, শুদ্ধ একেশ্বরবাদী হইতেছেন। পারস্য দেশে আবার মুসলমান ধর্ম্মের ভিতর হইতে, গোঁড়ামী বর্জ্জিত উদার ও বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ "বাহাই" নামে উদ্ভূত হইয়াছে। মানব-রাজ্যের প্রায় সকল দেশেই প্রথম অবস্থায়, যতদিন না জ্ঞানের ও সভ্যতার আলোক প্রকৃত ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছে, ততদিন এক এক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, যাহা ঐ দেশবাসীদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে সম্মিলিত, নানা প্রকার কুসংস্কার, গোঁড়ামী ও অনেকস্থলে কদাচার-জড়িত এবং পৌত্ত-লিকতা-বিশিষ্ট ছিল। লোকেরা তাহাতেই তুষ্ট ছিল। ধর্ম্ম-প্রচারের

আকাঙ্ক্ষাও প্রথমে, বোধ হয়, কোথাও ছিল না। যখন কোন কোন মহাজন আসিয়া ধর্ম্মের মধ্যে সংস্কার আনয়ন করিলেন, তখনই প্রচারের প্রয়োজন বোধ হইল ও প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইল। বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচার, ঈশার ধর্ম্মপ্রচার, মহম্মদের ধর্ম্মপ্রচার, জৈন ধর্ম্ম-প্রচার এই রূপে হইয়াছিল। ইহাদ্বারা ধর্ম্মের মধ্যে অশুদ্ধতা অনেক পরিমাণে অপনীত হইয়াছে। অনেক স্থলে এই প্রচার-কার্য্যে ধর্ম্মের নামে অনেক অত্যাচার, নৃশংস কাণ্ড, নরহত্যা হইয়া গিয়াছে। সভ্যতার ও জ্ঞানের উন্নতি সঙ্গে এখন ইহার অনেক পরিমাণে উপশম হইয়াছে।

জগতে ধর্ম্মের এই যে সব বিভিন্ন আকার, ইহার প্রকৃত কারণ মানুষের মনের উন্নতির তারতম্য। সহজজ্ঞানের আভাস দ্বারা পরিচালিত হইয়া, জগতের স্রষ্টাকে উপলব্ধি করিতে সকলেই প্রয়াসী; কিন্তু মনের উৎকর্ষের তারতম্যে সেই উপলব্ধি প্রকৃত ভাবে সকলের পক্ষে লাভ হয় না। তত্রাচ ঐ উপলব্ধি প্রাপ্তির আশায় সকলে ধাবিত হয়; কিন্তু মনের অক্ষমতা ও অনুপযুক্ততা বশতঃ নানা ভ্রমে পতিত হয়। এবং এই ভ্রম হইতেই নানা প্রকার বিভিন্নতা ও বিবাদের সৃষ্টি।

এক্ষণে সেই সকল অনুপযুক্ততা অনুভব করিয়া, সকল ধর্ম্মের সামঞ্জস্যের ও মিলন-সমন্বয়ের ব্যবস্থা হইতেছে। এখন মিলনের ধর্ম্ম জগতে আসিয়াছে। ইহা ভগবানেরই বিধান। ইহাই এ যুগের 'নববিধান'। নববিধানেই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় হইয়াছে।

এই যে জগতে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ, ইহা এক স্রষ্টাকে লইয়াই। তাঁহার স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে

উপলব্ধি করিয়াছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ উপলব্ধিকে সর্ব্বস্ব ও ভ্রমহীন মনে করিয়াছে। সেই জন্যই এক অন্যের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই, পরন্তু বিবাদ করিয়াছে। যখন এখন আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, সেই একই ঈশ্বরের উদ্দেশের দিকে সকলেই গমন করিতেছি, এবং সকলেই একেরই কথা প্রকারান্তরে প্রকাশ করিতেছি, তখন সকলেই আমরা প্রকৃতপক্ষে একোদ্দেশী এবং সেই একেরই অনুগত। সকলেই তখন মিলিত-কণ্ঠে তাঁহারই মহিমা কেন ঘোষণা করিবে না, এবং কেনই বা সকলে একত্র সম্মিলিত হইবে না? সকলের বিভিন্নভাবে দর্শন যখন সরল ও সত্যমূলক হইবে, তখন সেই সকল দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যতা অবস্থিতি করিতেছে, দেখা যায়। এই সকল সত্যের সামঞ্জস্যভাবে মিলন দ্বারাই ভগবানের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি হইবে। বর্ত্তমান বিধান নববিধানের আগমন এই শিক্ষা দিবার জন্যই। ইহা সত্যস্বরূপকে সত্যভাবে, জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিবার জন্যই আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। এতদিন যেন মানুষ তাঁহাকে খণ্ডভাবে, ভগ্নভাবে, কল্পনোদ্ভাসিত ঈশ্বর করিয়া দেখিতেছিল; তাঁহার এক এক গুণ লইয়া তাহাকেই পূর্ণ ঈশ্বর মনে করিতেছিল। এখন আর কল্পনার রাজ্য রহিল না, সেই অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বয়ং জীবন্তভাবে দেখা দিতেছেন। সুতরাং সকল খণ্ড আকার এই জীবন্ত আকারে একত্রিত হইল, সকল বিবাদের মূল ঘুচিয়া গেল, মিলনের রাজ্য দেখা দিল। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের এই লক্ষণ। যেমন ঈশ্বর একই, ইহা প্রকাশিত হইল, তেমনি সমগ্র মানব যে সেই একেরই সন্তান, তাহাও

প্রকাশিত হইল ; সকল সম্প্রদায়ে ভ্রাতৃভাব জন্মিল, সাম্প্রদায়িকতার ভাব ঘুচিয়া গেল।

খণ্ড খণ্ড ভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি প্রবল হওয়ায়, হিন্দুধর্ম্মে তেত্রিশ কোটী দেবতার উদ্ভব হইল। কিন্তু এই তেত্রিশ কোটী দেবতা বাস্তবিক কি? প্রত্যেক দেবতা সেই অনন্ত গুণের আধার ভগবানের গুণের এক এক খণ্ড মাত্র। তিনিই বিদ্যা, সুতরাং তিনি সরস্বতী ; তিনিই জ্ঞানের আধার, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অতএব তিনি গণেশ ; তিনি তেজ ও দীপ্তির আধার, অতএব তিনিই সূর্য্য ; তিনিই অগ্নির অগ্নিত্ব, অতএব তিনি অগ্নি ; তিনি মহাপ্রবল-শক্তিসম্পন্না শুভবুদ্ধির আধার, অতএব তিনি দুর্গা ; তিনি সর্ব্ব-মঙ্গলদাতা, অতএব তিনি শিব ; এইরূপে তিনিই বিষ্ণু, তিনি ইন্দ্র, তিনি বরুণ ও পবন। এই রূপে এক একটী গুণ লইয়া এক এক দেবতা। দুঃখের বিষয় এই যে, একই বিধাতার এক একটী গুণকে এক একটী পৃথক দেবতা কল্পনা করিয়া পূজা করে, এবং অন্য দেবতার (অর্থাৎ ভগবানের অন্য গুণের) উপাসকদিগের সঙ্গে বিবাদ বিতণ্ডা করে। এই সমস্ত বিভিন্ন-ভাবাপন্ন কল্পনাই যত অনিষ্টের কারণ। ইহা হইতেই বিভিন্ন দল, সম্প্রদায় সব সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জগন্ময় এ সকল বিভিন্নতা সত্ত্বেও, মানবমণ্ডলীর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ সত্ত্বেও, ভগবান্ সকলেরই হৃদয় দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি দেখিয়া আসিতেছেন যে, ক্ষুদ্র মানব তাঁহারই প্রয়াসী হইয়া, ভ্রমে পড়িয়া এত বিবাদ করিয়া আসিতেছে। সেজন্য ইহারই মধ্য দিয়া, যেখানে তিনি তাঁহার জন্য আকিঞ্চন ও পিপাসা দেখিয়াছেন, সেইখানেই সে

হৃদয়ে কোন না কোনরূপে সেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেখানে কোন না কোন রূপে দর্শন দিয়াছেন ও প্রাণে তৃপ্তি দিয়াছেন, আশা ও আশ্বস্ততা দিয়াছেন। অবশ্য এ তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, আবার খণ্ডশঃ উপলব্ধির নিমিত্ত যে অবশ্যম্ভাবী মন্দফলগুলি. তাহাও রহিয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও, মানুষের জীবন অনেক পরিমাণে নির্ম্মল হইয়াছে, শান্ত হইয়াছে। ইহা মহিমাময়েরই মহিমা।

আমরা দেখিলাম যে, যত বিভিন্ন প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, সে সকল আর কিছু নয়, কেবল ক্রমশঃ পূর্ণধর্ম্মকে প্রকাশ করিবার বিভিন্ন চেষ্টা মাত্র। প্রথম হইতেই মানুষ এই চেষ্টারই অনুগামী। মনের অবস্থার উৎকর্ষের তারতম্যের অনুযায়ী ফলও হইয়াছে। কোনস্থলে দৃষ্টিভ্রান্তি ও ভ্রম আসিয়া পড়িয়াছে। সরলভাবে পবিত্র-চিত্তে যে যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছে, যে দিকে গিয়াছে, যেরূপ চেষ্টা করিয়াছে, তাহা সমুদায় মানুষকে সেই প্রকৃত সত্যবস্তুকে দেখিবার পথে অগ্রসর করিয়াছে, সহায়তা করিয়াছে। পূর্ণধর্ম্ম-প্রকাশের পথ পরিষ্কার করিয়াছে। এখন যে বর্ত্তমানে আমরা সুন্দর সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মবিধান পাইয়াছি, ইহা এই সমস্ত ব্যষ্টি-চেষ্টার সমষ্টির শুভফল। এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম খণ্ডসকলকে একত্র করিয়াছে। ইহার মধ্যে সকলেরই স্থান বিদ্যমান। ইহা ভুলিলে আমরা বর্ত্তমান যুগধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে, উপলব্ধি করিতে, কিম্বা বুঝিতেও সক্ষম হইব না। ইহাকে বিশেষ করিয়া আমাদের বুঝিতে হইবে। যত প্রকার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আছে, তাহার মধ্যে সত্যও আছে. আবার মানুষের সংকীর্ণতা-হেতু ও দুর্ব্বলতা-বশতঃ অনেক অসত্য ও ভ্রম তাহাতে

স্থান পাইয়াছে। আমাদের সত্যগুলি গ্রহণ করিতে হইবে ও অসত্য ভ্রমগুলি পরিহার করিতে হইবে। এই সত্যগ্রহণ কেবল মাত্র জ্ঞানে বা মতে না করিয়া, ইহা জীবনে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সমস্ত সত্যকে যেন আগুনে গলাইয়া, একটী রাসায়নিক দ্রব্যে পরিণত করিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বরেতে সেই সব দ্রব্য সেইরূপ ভাবেই আছে। আমাদের জীবনে তাহারই অংশ আসিবে। এইরূপ করিলে তবে বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আমরা সমর্থ হইব। তখনই সকল সত্যের সামঞ্জস্য দেখা যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা তিরোহিত হইবে। এই যে গলাইবার আগুন, স্বর্গ হইতে বিধাতার কৃপায় অবতীর্ণ হয়। তখন আর সঙ্কীর্ণতা তিষ্ঠিতে পারে না, হৃদয় উদারভাব প্রাপ্ত হয়, মানুষ প্রেমিক হয়, কোমল-প্রকৃতি ও নম্র হয়।

ঈশ্বর-স্বরূপ-লক্ষণ গুণ

ভগবান্ মানুষের নিকট আপনিই প্রকাশিত হয়েন, সুতরাং ভগবান্‌কে মানুষ সহজজ্ঞানে দর্শন করে। সেই জন্যই মানুষ তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তিনি আছেন—তাহা জানিতে পারে, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার গুণসম্বন্ধে, যতদূর সম্ভব, তাহার জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু ভগবানের গুণের কথা বলিতে গিয়া, আমাদের একটী বিষয় বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক। আমরা যখন সাধারণতঃ পদার্থ-সকলের গুণের কথা বলি, আমাদের ধারণা থাকে, যে যে বস্তুর যে যে গুণ আছে, তাহা তাহাতে যেন

সৃষ্টিকর্ত্তাই অর্পণ করিয়াছেন এবং সেই জন্যই তাহার সে গুণ আছে। ইহাতে প্রকারান্তরে ইহাই প্রকাশ পায় যে, সে সব গুণ ঐ বস্তুর নাও থাকিতে পারিত, থাকা নাও সম্ভব হইত, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার ব্যবস্থাতেই ঐ সব গুণ বর্ত্তিয়াছে। বস্তু ও গুণ একই পদার্থ নহে। উহা একত্র করা হইয়াছে। গুণ ও বস্তু যেন পৃথক পৃথক সামগ্রী। বস্তুটী যেন প্রকৃতপক্ষে তাহার গুণগুলির অবলম্বন বা সমষ্টি। অতএব যেন গুণের অস্তিত্ব ও অবস্থিতি বিধাতার বিধাতৃত্বের উপর নির্ভর করে এবং বস্তুর উপর নির্ভর করে না। এ ধারণা ভগবান্ সম্বন্ধে খাটেনা। তিনি গুণের সমষ্টি নহেন। তিনি এক অদ্বিতীয়, একই অবস্থিতি বা অস্তিত্ব ও বস্তু। তিনি যেন স্বয়ং অযৌগিক মূল অস্তিত্ব। তাঁহার গুণই তিনি, এবং তিনিই তাঁহার গুণ। তিনি গুণ, অস্তিত্ব, বস্তু সবই একাধারে। সেই একই একক তিনি, এবং সেই একই আমাদের নিকট, আমাদের নিজেদের শক্তির অবস্থা অনুসারে, কখনও কোনরূপে, কখনও কোনরূপে পরিলক্ষিত হয়েন। মূলতঃ এক অখণ্ড অবিমিশ্র, কেবল আমাদের দৃষ্টি-অনুসারে ভিন্ন রূপে উপলব্ধ হয়েন। সেই একই তিনি অবস্থিতি, গুণ, জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, তেজ, পবিত্রতা ইত্যাদি সমগ্র জীবন্ত। ইহাই তাঁহার গুণের বা লক্ষণের প্রকৃত কথা, প্রকৃত পরিচয়। যদি গুণকে স্বতন্ত্র করি ও তাঁহাকে গুণের আধার বা সমষ্টি মনে করি, তাহা হইলে ঈশ্বর আর ঈশ্বর রহিলেন না, তিনি যে সমষ্টিকৃত বিমিশ্রিত অস্তিত্ব হইয়া গেলেন। কিন্তু ঈশ্বর তো তাহা নহেন—তিনি খোদ খোদা, তিনি জিহোবা, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম—অনাদি, অনন্ত,

কারণ-রহিত, স্বয়ম্ভু অধিষ্ঠান। আমরাই তাঁহাকে কখন জ্ঞান বলি, কখন শক্তি বলি, কখন প্রেম বলি, কখন পুণ্য বলি, আবার কখন পিতা, মাতা, কখন স্রষ্টা বলি, কখন হরি, কখন বিশ্বেশ্বর বলি, কখন বিধাতা বলি, দণ্ডদাতা বলি, মুক্তিদাতা বলি ; এইরূপ কত কি বলিয়া ডাকি ও উপলব্ধি করি। এ সকলত তিনি বটেনই—আরও যে কত কি তিনি, কে জানে। একই তিনি নানা গুণে নানা ভাবে প্রকাশিত। জগতে যত কালে, যত দেশে, যত সরল হৃদয় হইতে যত স্তব, স্তুতি, বন্দনা উত্থিত হইয়াছে, সকলই সাক্ষাৎ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে তাঁহারই উদ্দেশে হইয়াছে, এবং তাঁহারই চরণে অর্পিত হইয়াছে। তিনি অন্তর্য্যামী, মানুষ তাঁহাকে না বুঝিলেও, তিনি মানুষের অন্তর বুঝিয়া তাহার সেই সকল ভাব উপযুক্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহাকে ডাকিবার আর অন্ত নাই। তিনি এক এককভাবে অবস্থিত। যাহাকে আমরা সামান্যভাবে গুণ বলি, তিনি সে সকল গুণের অতীত, অথচ তিনিই সকল গুণের আধার।

ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধির মূলে সহজজ্ঞানলব্ধ যে আভাস, তাহার উল্লেখ ও আলোচনা পূর্ব্বেই হইয়াছে। মানবের সকল শক্তিই সহায়তা করিয়া, এই উপলব্ধির পরিস্ফুটন আনয়ন করে। জ্ঞান, চিন্তা, বিচার, কল্পনা, রুচি, ভাব ইত্যাদি সকলই এই কার্য্যে নিযুক্ত হয়। যে আভাস মানুষ দেখে, সে কেবল অপরিস্ফুট আভাস; কিন্তু তাহারই ভিতর একত্রিত হইয়া, সকল প্রকার গুণেরই আধার থাকেন। তিনি এক, একক, অথচ সকল গুণেরই আধার ; সুতরাং সে আভাসে তাঁহারই আভাস প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁহাকে ধরে

কে? যতক্ষণ না মানুষ উপযুক্ত হয়, সে কি তাঁহাকে ধরিতে পারে? ইহা অসম্ভব। মানবের শক্তি-সকলের চালনা করিয়া তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি একটু একটু বৰ্দ্ধিত হয় এবং এইরূপে ক্রমশঃ মানুষের উন্নতি ও মুক্তি হয়। ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতার প্রয়োগে সাধনা করিয়া মানুষ আপনাকে উপযুক্ত করে ও ক্রমে তাঁহার দর্শন লাভ করে; তিনি উপযুক্ত অবস্থায় ও অবসরে দেখা দেন। মানুষ ক্রমশঃ যেমন তাঁহাকে বুঝিতে থাকে এবং তাহার বিশ্বাস ভক্তি বাড়িতে থাকে, মানুষ মুক্ত হয়, চরিতার্থ হয়, স্বর্গের সুখ-সুধা প্রাপ্ত হয়। এই প্রণালীতে ভগবানের রূপের পরিচয় হয়, গুণের উপলব্ধি হয় ও তাঁহার গুণকীৰ্ত্তনের প্রবৃত্তি মানব-মনে প্রবল হয়। ব্রহ্মসম্বন্ধে বিশেষ অন্তরগ্রাহী উপলব্ধি এই যে, তিনি অনন্ত অসীম— তাঁহার সীমা নাই, অন্ত নাই, আরম্ভও নাই, শেষও নাই। তিনি কেমন করে অবস্থিত, ইহা আমাদের বুদ্ধি মনের অগোচর ও অগম্য। আমরা যাহা দেখি, যাহা জানি, যাহা ভাবি, যাহা কল্পনা করি, সকলই মনে হয়, যেন কোন সময়ে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্ম নিত্য অবস্থিত, কখন তাঁহার আরম্ভ হয় নাই, তিনি অনাদি। ইহা আমাদের সম্পূর্ণ ধারণার অতীত হইলেও, তাঁহার সম্বন্ধে ইহাই সত্য। তাঁহাকে দেখিলেই, ভাবিলেই আমাদিগকে স্তম্ভিত হইতে হয়।

এই যে তাঁহার আদি-অন্ত-বিহীনত্ব ভাব, ইহা তাঁহার সকল বিষয়েই। তাঁহার সত্তা, তাঁহার অবস্থিতি, তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার গুণ, তাঁহার লক্ষণ, যাহা কিছু আমরা বুঝি, সকলই এই ভাবে মণ্ডিত। এখানেই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, অসীমত্ব এবং আমাদের বোধের, চিন্তার প্রকাশের অতীত ভাব। অথচ ইহাই সত্য। মানুষ এই ভাবই

দেখে ও বিশ্বাস করে, প্রতীতি করে। ব্রহ্মসম্বন্ধে এই এক মহান্ বিশেষত্ব। সৃষ্টির মধ্যে এ ভাব, এরূপ ব্যাপার আমরা কোথাও দেখিতে পাই না ; অথচ সৃষ্টিতে এমন সব বিষয় আছে, যাহা নিজে এ ভাবযুক্ত না হইয়াও, এ ভাব উদ্দীপন করে, ইহার দিকে ইঙ্গিত করে, ইহার প্রতি নির্দ্দেশ করে, ঠিক যেন অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দেয়। ইহা নিজেকে পরিচিত করিবার জন্য অনন্তের এক লীলা।

সৃষ্টিতে আমরা যত কিছু দেখি, সকলই সীমাবিশিষ্ট ; অনন্ত সম্বন্ধে তাই আমাদের ধারণা এই যে, "ইহা নহে" "উহা নহে"—ইহা অপেক্ষাও মহান্—যত কিছু বৃহৎ আমরা দেখি, যতই বড় হউক না কেন, বৃহত্ত্বের যত বড় কল্পনা করি না কেন, তাহা অপেক্ষাও আরও প্রকাণ্ড—যত কিছু ক্ষুদ্র দেখি না কেন, কল্পনা করি না কেন, তাহা অপেক্ষাও আরও ক্ষুদ্র। এইজন্য কিছুতেই, কোনও দিকেই অন্ত নাই। মাত্র এই, এইরূপে অনন্তের ধারণা আমাদের মনে হয়। ইহা হইতে পরিষ্কার ধারণা করিবার শক্তি মানব-মনের নাই ও থাকা সম্ভব নহে। অনন্ত যিনি, তিনি নিজেই কেবল আপনাকে জানেন ও বুঝেন। তবে আমরা যখন অনুভব করি যে, আমাদের চক্ষে যাহা অসামঞ্জস্য, তাহাই আবার তাঁহাতে সামঞ্জস্যভাবে অবস্থিত—যেমন তিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আবার মহান্ হইতেও মহান্—যেমন তিনি একদিকে রুদ্র, অন্যদিকে মহাকরুণাময়—যেমন তিনি পিতাও বটেন, আবার মাতাও বটেন—আমরা অবাক্ হইয়া বলি, 'তুমি ভূমা মহান্'। এইরূপ অনন্তের উপলব্ধি। আমাদের জ্ঞানে, শাস্ত্রে, পাণ্ডিত্যে, বেদে, কোরাণে, বাইবেলে কোথাও কেহ তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। যোগী ঋষি

মহাজন সকলেই সর্ব্বত্র তাঁহার তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অনেক তত্ত্ব পাইয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহার পূর্ণতা নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

এই অনন্তভাব যখন আমরা অনুধাবন করিয়া দেখি, তখন সহসা আমাদের মনে হইতে পারে যে, যখন তিনি সর্ব্বভূতে, সর্ব্বত্র ও সকল ব্যাপারেতে বিদ্যমান, তখন অন্যবস্তুতে ও তাঁহাতে কোন প্রভেদ নাই—তিনিই এ সব বস্তু, এবং সকল বস্তুই তিনি। এইরূপ অদ্বৈতভাব মনে হইতে পারে। বাস্তবিক জগতে এইরূপে অদ্বৈত-বাদ মত প্রচলিত হইয়াছিল এবং এখনও তাহা কোন কোন লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে। এ মত ঠিক নহে। তাঁহার সৃষ্টি-রচনার সহিত এই যে তিনি সর্ব্বত্র ও সমস্তের ভিতরে বর্ত্তমান, অথচ সকল পদার্থ আবার তাঁহা হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে স্থিত। তিনি সকলই পরিচালিত করিতেছেন, কিন্তু কিছুরই সঙ্গে তিনি এক হইয়া যান নাই। আমরা নিজেরা তাঁহারই দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত ও সংরক্ষিত, অথচ আমরা নিজেরাই স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, তিনি আমাদের সঙ্গে এক নহেন। আমরা পাপী, তিনি পবিত্র অপাপবিদ্ধ; আমরা অপূর্ণ ও অভাববিশিষ্ট, তিনি পূর্ণ; আমরা তাঁহার পূজা করি, তিনি আমাদের পূজা গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের মুক্তিদাতা, পরিত্রাতা; আমরা তাঁহারই কৃপায় পাপ হইতে পরিত্রাণ পাই। এই সকল হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি আমাদিগ হইতে স্বতন্ত্র পৃথক্। তেমনি সকল সৃষ্ট বস্তুই তাঁহা হইতে পৃথক্। বেদান্তে এক প্রকার মত আছে, যাহাতে মানুষ বলে, "আমিই ব্রহ্ম", তবে অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মের

সঙ্গে পার্থক্য ঘটে, এবং সেই অবিদ্যানাশের জন্য সাধনা ও প্রয়াস করে, যদ্দ্বারা তাহা (অবিদ্যা) হইতে মুক্তি পাইয়া, "আমিই ব্রহ্ম" প্রকৃতভাবে অনুভব করিতে পারে। ইহা কেবল ভ্রান্তিমাত্র। কেহ এরূপ মুক্তি পাইয়াছেন, তাহা দেখাও যায় নাই, শোনাও যায় নাই। এ মত একটী মত মাত্রই হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মের অনন্তত্বের ভাব, ব্যাপিত্বের ভাব ভাবিলে, এ মতের পোষকতা কথঞ্চিৎ প্রথমতঃ মনে হয় বটে, কিন্তু জীবনে, কার্য্যে, ব্যাপারে ইহা তিষ্ঠিতে পারে না ; যাহা সত্য তাহাই প্রকাশ পায়, উপলব্ধ হয়। অসীমকৌশলশালী বিশ্বস্রষ্টা, আমরা তাঁহার লীলা বুঝিতে না পারিলেও, সমস্তই তাঁহা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন। এই যে পৃথক্ করিয়াছেন, তাহা কিন্তু আমরা অনুভব করি। এই পৃথগ্‌জ্ঞান অবিদ্যার কার্য্য নহে, ইহা সত্য ব্যাপার। এই উপলব্ধি করিয়া আবার অন্য শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন যে, অদ্বৈতবাদ-মতই ঠিক বটে, তবে ইহা "বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ," অর্থাৎ কার্য্যক্ষেত্রে, জীবনক্ষেত্রে অদ্বৈততা নহে।

অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন যে, ব্রহ্ম আর কিছু নহে, কেবল এই সমস্ত সৃষ্টপদার্থের সমষ্টি মাত্র। এ মতও ভ্রমপূর্ণ। ইহা হইলে ব্রহ্মের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব লোপ পায়। কিন্তু আমরা জানি যে, আমরা উপলব্ধি করি যে, তিনি এক অনন্ত অখণ্ড অসীম পুরুষ। তিনি মহাকার্য্যকারী অনন্ত তেজোময় পুরুষ।

ব্রহ্মের অনন্তত্ব উপলব্ধি করিয়া অনেকে তাঁহাকে গুণময় বলিতে ও ব্যক্তি বলিতে সঙ্কোচ করেন। গুণ বলিলে আমরা প্রায়ই সেইরূপ গুণের ভাব মনে পোষণ করি, যাহা সৃষ্টবস্তুতে সংলগ্ন ও যাহা

আমরা সীমাবিশিষ্ট সৃষ্টবস্তুতে দেখিতে পাই ; এবং ব্যক্তি বলিলে সেইরূপ সীমাবদ্ধশক্তিধারী ব্যক্তির ভাবই মনে আইসে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তিনি সকল বিষয়ের বিন্দু বিন্দু সীমাবিশিষ্ট ভাব মাত্র আমাদিগেতে, ক্ষুদ্র সৃষ্টবস্তু-সমূহে দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং কিন্তু সকল বিষয়ের অনন্ত আধার। আমাদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা হইতে, আমাদের সেই অসীমত্বের কথঞ্চিৎ পরিচয় হয়, উপলব্ধি হয়। আমাদের ক্ষুদ্রতা দ্বারা আমরা তাঁহার অসীমত্বের খর্ব্বতা করিব না, কেবল ইহা অবলম্বন করিয়া সেই অসীমকে বুঝিতে ও ধরিতে চেষ্টা করিব। তিনি অসীম—কিন্তু কিসে অসীম ?—এই সকল মহৎ গুণে ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বে অসীম, যাহার অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র তিনি মানবে ও সৃষ্টপদার্থে অর্পণ করিয়াছেন। এইরূপে আমরা তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

"কে জানে বিভু কেমন।

যাঁর না পায় অন্ত, কত শত যোগী ঋষি জ্ঞানী মহাজন।

জ্ঞানে বিজ্ঞানে বুদ্ধিতে হয় না যাঁর তত্ত্ব নিরূপণ ; ও সেই অনন্ত
সচ্চিতে, চর্ম্ম-চক্ষেতে না হয় দরশন।

বেদ বেদান্ত আদি ন্যায় পুরাণ ষড়্‌দরশন ; সব তন্ন তন্ন করে'
যাঁর না পায় কেহ অন্বেষণ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাঁরে করে' অবলম্বন ; তিনি ঘটে ঘটে
বিরাজ করেন হইয়ে জীবনের জীবন।

সেই পারে জানিতে তাঁরে ভক্তিভাবে ডাকে যে জন ; তিনি
সরল সাধকের নিকট আত্মস্বরূপ করেন প্রকটন।"

—ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রথম আলোচ্য বিষয় এই যে, তিনি সত্য—তিনি আছেন—তিনি সত্যস্বরূপ। ইহার ভিতর অনেক নিগূঢ় অর্থ আছে; ধৈর্য্যের সহিত, শান্তমনে আলোচনা করিতে হইবে।

সত্য শব্দে আমরা বুঝি, যাহা প্রকৃতপক্ষে আছে—অবস্থিত, অথবা যাহা ঘটিতেছে বা ঘটিয়াছিল। যাহা নাই—যাহা হয় নাই—যাহা ছিল না—যাহা ঘটে নাই, তাহা সত্য নহে। সত্যের সঙ্গে প্রকৃত অবস্থিতির—অস্তিত্বের ভাব সংশ্লিষ্ট। যাহা কল্পনা, যাহা মনের খেয়াল—যাহা কেবল চিন্তা মাত্র, ধারণা মাত্র, বস্তু নহে, এমন সকল বিষয় তত্তৎভাবে সেইরূপ সত্য, কিন্তু প্রকৃত সত্য নহে; তাহা কাল্পনিক বিষয়, ভাবুকত্ব, কেবল অনুমান কিম্বা এক প্রকার ধারণা মাত্র। এইরূপ সত্যাসত্যের ভাব। সহজজ্ঞানে পরমাত্মা বিষয়ে যে আভাস লাভ হয়, তাহার মূল কেন্দ্রভূমি তাঁহার সত্যতা, তাঁহার অবস্থিতি, তাঁহার প্রকৃতভাবে থাকা। আমরা যখন সহজজ্ঞানে দেখি, তখন দেখি যে, সমস্ত পদার্থ তাঁহাতে আশ্রিত, তিনি সকলের আশ্রয়। এইরূপ ভাবে সৃষ্টি আছে, আর তাহার আশ্রয়ভাবে তিনি আছেন। সুতরাং এই যে থাকার ভাব, তাঁহার সঙ্গে একেবারে সম্মিলিত। ইহাতেই তাঁহার সত্যস্বরূপ রূপের মূল উপাদান যেন কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তিনি আছেন—তিনিই আছেন—তবে সব আছে—আমরা আছি—সকলের স্রষ্টা হইয়া, অনন্ত আশ্রয় হইয়া তিনি রহিয়াছেন। সহজজ্ঞানের আভাস যেন এইরূপ বলিয়া দেয়। এই আভাস মানুষের বিভিন্ন শক্তির সহায়তায় ক্রমশঃ পরিস্ফুটিত হয়, এবং তাহাতেই ভগবানের সত্যস্বরূপতা ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর

ভাবে উপলব্ধি করিতে আমরা সমর্থ হই। যাহার মনের অবস্থা যত উৎকৃষ্ট, তাহার এই উপলব্ধি-শক্তি ততই অধিক হয়।

এই যে সত্যতা—অবস্থিতি—ইহার কতই ক্রম আছে। সময়ে আছে, স্থানে আছে, গভীরতায় আছে, নিবিড়তায় আছে, জ্বলন্ত উদ্ভাসনে আছে—এইরূপ কত ক্রম। আবার এক পদার্থের অবস্থিতি—উৎপত্তি অন্য হইতে হয়। কোথাও এক অন্য হইতে ভিন্ন, আবার কোথাও এক তাহার অবলম্বন ভিন্ন থাকিতে পারে না। এইরূপে কত প্রকার সত্যতার ক্রম দেখা যায়। জড় পদার্থে, বায়বীয় পদার্থে, ভাবরাজ্যে, আত্মিক বিষয়ে এইরূপ সত্যতার ক্রম পরিদৃষ্ট হয়। ইহার যেন আর অন্ত নাই। সত্যের ভাব এইরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

এই যে সত্যতার এত প্রকার ক্রম, এ সব কোথা হইতে আসিল? যেখানে কিছুই নাই, সেখানে কিছু ফলাফলও উৎপন্ন হয় না। এই যে সব সত্যের এত আকার, এ সব কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? এ প্রশ্নের উত্তর সহজজ্ঞানের আভাসে আমরা পাইতেছি যে, সেই পরব্রহ্ম হইতেই এ সমস্ত সমুৎপন্ন ও তাঁহাতেই এ সমস্ত বিধৃত ও আশ্রিত। তিনিই সত্যস্বরূপ, সত্যের প্রকৃত মূলাধার। তাঁহার নিজের শেষও নাই তিনি অনাদি অনন্ত অবস্থিতি। তাঁহা হইতেই সত্যের সকল প্রকার আকার, ক্রম ইত্যাদি সমুদ্ভূত। তিনিই সত্যাকার, সত্যাধার, সত্যস্বরূপ।

সকল পদার্থই দেখা যায়, কালেতে সীমাবদ্ধ। আজ আছে, কাল নাই; কেহ কিছু বেশী দিন, কেহ অল্পদিন আছে; কেহ দুই মিনিট থাকে, অন্য কিছু দুই তিন হাজার বৎসর থাকে। এ সকল

সেই পরব্রহ্মের অস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব পাইয়াছে—যাহার যতটুকু জীবন ও পরমায়ু তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ পাইয়াছে। প্রত্যেক জীবন ও আয়ুর নিভৃত মূলশক্তি, অবস্থিতির মূল আধার সেই তিনিই। তিনিই নিত্য, অক্ষয়, অমর। অতএব যখন আমরা তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করি, আমরা তাঁহাকে নিত্য, চির অবস্থিত, অক্ষয়, মৃত্যুর অতীত, কালাতীত বলিয়া দেখি। এমন আর কেহ নাই। যেমন তিনি কালের অতীত, তেমনি তিনি দেশের, স্থানের, আকাশেরও অতীত। জড়ীয় পদার্থ সকল দেশ অধিকার করিয়া থাকে—কেহ অল্প, কেহ অধিক স্থান অধিকার করে; কিন্তু তিনি স্থানেতে আবদ্ধ নহেন। স্থানই আকার দেয়, জড়াকার দেয়; কিন্তু পরব্রহ্ম নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী। তিনি অণুও নহেন, বৃহৎও নহেন, আবার অণুর অণু, মহান্ হইতেও মহান্। যাহা কিছু স্থানের বশীভূত, তিনিই তাহাদিগকে সেইভাবে বশীভূত করিয়াছেন। মানবাত্মা তাঁহারই ব্যবস্থায় স্থানাধিকারী আকারবিশিষ্ট দেহের বশীভূত হইয়াছে, নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ সকলই তাঁহারই সৃষ্টি, কিন্তু তিনি স্বয়ং দেশ কালের অতীত। সত্যস্বরূপ বলিলে, শুদ্ধতত্ত্ব-জ্ঞান আমাদের নিকট তাঁহার এই পরিচয় আনিয়া দেয়। মানবে ব্রহ্মজ্ঞানের যত কিছু উৎকর্ষ দেখা দিয়াছে, সমস্তই সহজজ্ঞানের আভাসের ক্রমোন্নতি হইতেই হইয়াছে। সে ব্রহ্মাভাস আদিতে ঠিক কিরূপ ও কতটুকু ছিল, তাহা বর্ত্তমানে উন্নত মানবসমাজে নির্ণয় করা সুকঠিন, অসম্ভবই একরূপ বলা যাইতে পারে। তাহা নির্ণয় করিবার প্রয়াসের আবশ্যকতাও দেখা যায় না। ক্ষুদ্র

শিশুরূপে মানুষ কতটুকু আহার করিত, বড় হইয়া তাহা জানিবার প্রয়োজন থাকে না। জীবজন্তু সকলের সংস্কার-অনুযায়ী কার্য্য পূর্ব্বাপর একই অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। মধুমক্ষিকা আগেও যেভাবে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিত, এখনও ঠিক সেইভাবেই করিয়া থাকে। তাহাদের সংস্কারের ঠিক কিরূপ কার্য্য, তাহা সকল সময়েই বোঝা যায়, কোন তারতম্য না থাকায়। কিন্তু উন্নতিশীল মানবের পক্ষে সেরূপ নহে। সেজন্য আদিতে সহজজ্ঞানের আভাস ঠিক কিরূপ ছিল, এখন মানবের পক্ষে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। অনুমান দ্বারা যতটা বুঝা যায়, সেই পর্য্যন্ত এবং তাহারই চেষ্টা হইতেছে। এবং সেই ভাবেই ক্রমশঃ জ্ঞান, ধর্ম্ম, সভ্যতায় উন্নত মানুষ সহজজ্ঞানের মূল উপলক্ষ্য করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপের কিরূপ পরিচয় পাইতেছে, তাহাই বর্ণন করিবার প্রয়াস হইতেছে।

এই সহজজ্ঞানের আভাসে আমরা পরব্রহ্মকে সর্ব্বমূলাধার সর্ব্বাশ্রয় রূপে উপলব্ধি করি। ইহাতেই দেখি যে, তাঁহার অস্তিত্ব—সত্যস্বরূপতা তাঁহার প্রথম লক্ষণ। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জড়িত রহিয়াছে যে, তিনি জড় অস্তিত্ব নহেন, তিনি জীবন্ত চৈতন্যময়। নির্জীব প্রস্তরখণ্ডও আছে, মৃত্তিকা কর্দ্দমও আছে, জলও আছে—এরূপ কত শত শত প্রাণহীন পদার্থ রহিয়াছে। তিনি সেরূপ কিছুই নহেন। যাঁহার সৃষ্টি, যিনি সমস্তকে আশ্রয় দেন, যিনি সর্ব্বোপরি, তিনি স্বয়ং মৃত জড় অস্তিত্ব কিরূপে হইতে পারেন? তিনি অবশ্যই জীবন্ত ও চেতনাপূর্ণ। যেমন তাঁহার অস্তিত্ব—অবস্থিতি—হইতে সৃষ্টিতে সমস্ত অস্তিত্ব এবং নানা ভাবে নানা ক্রমে সে অস্তিত্বের প্রকাশ

হইয়াছে, তেমনি তাঁহার জীবন্তত। ও সচেতনতা হইতে সৃষ্টিতে নানাভাবে ও নানাক্রমে সেই জীবন্ততা ও সচেতনতা আসিয়াছে। তিনি অনন্তজীবন-স্বরূপ, অনন্তচৈতন্যময়, অনন্তজ্ঞান, তিনি সর্ব্বজ্ঞ অসীমকৌশলময়। এই তাঁহার আর একটী লক্ষণ। সৃষ্টিতে ইঁহারই অসীম জ্ঞান ও আকারের প্রকাশ। কত জীব কত রকমে জীবন ধারণ করে, এবং এই সমস্ত জীবের মধ্যে চেতনা ও জ্ঞানেরই বা কত ক্রম, আকারও কত প্রকার। এ সমস্তই সেই চৈতন্যস্বরূপ হইতে উদ্ভূত—তিনিই এ সকলের মূলে। তিনি জ্ঞানময়, অন্তর্য্যামী, নিত্য সচকিত, সর্ব্বসাক্ষী, গুরু ও জ্ঞানদাতা।

কিন্তু তিনি কেবল জ্ঞানমাত্র নহেন—তিনি যে সমস্তই করিয়াছেন। তিনি বল, শক্তিস্বরূপ—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। সেই সত্যস্বরূপের অস্তিত্ব তখনই সম্ভব, যখন তিনি সমস্ত জানিয়া শুনিয়া, সমস্তকে শাসনে রাখিয়া স্বয়ং অবস্থিতি করেন। নতুবা নানা ঘটনায়, নানা শক্তি দ্বারায় শক্তিহীন হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইতেন। এইজন্য তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া আপনাকে আপনার অস্তিত্বে অবস্থিত রাখিয়াছেন। যতই আমরা নিবিষ্টমনে মগ্ন হইয়া দেখিতে যাই, ততই এ সকল গুণই—লক্ষণই—তাঁহার সেই সহজজ্ঞানের আভাসেরও ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে থাকে। তাঁহার সত্যস্বরূপতাই নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, তিনি সত্যস্বরূপ হইয়াছেন এই জন্য যে, তিনি নিত্য সর্ব্বব্যাপী, অসীম, জীবন্ত চৈতন্যময়, অটল দৃঢ় সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি এইরূপ না হইলে তাঁহার অস্তিত্বই লোপপ্রাপ্ত হইত।

তিনি কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে আছেন, তাহাতো নহে। সহজ-জ্ঞানই আবার দেখাইয়া দিতেছে যে, তিনি সৃজনকর্ত্তা, স্রষ্টা ও সর্ব্বাশ্রয়। তিনি সমস্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন। মহাজ্ঞানের ও মহাকৌশলের নিদর্শনে সকলই পরিপূর্ণ। যাহা যেমনটী হওয়া আবশ্যক, তাহা তেমনি হইয়াছে ও হইতেছে। অসীম নিপুণতায় সমস্তই পূর্ণ। কোথাও কিছু মাত্র ত্রুটি নাই। তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। সৃষ্টির রচনা-কৌশল যতই আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর নিকট উন্মুক্ত হইতেছে, ততই আমরা তাহার পারিপাট্য, তাহার বিপুল উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইতেছি। যাহা চাই, তাহা পাই, কিছুরই অভাব নাই। মহা আশ্চর্য্য মহিমা তাঁহার। অতএব তিনি কেবল অবস্থিতি নহেন; তিনি অসীম শক্তি, অসীম জ্ঞান। তিনিই কৌশল, যে কৌশলে কখনও কোন অভাব হয় নাই ও হইবে না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একেবারে মহাশূন্যতা হইতে, তাঁহারই শক্তিতে ও কৌশলে, এমন সুনিপুণ পূর্ণতাপূর্ণ হইয়া সৃজিত হইয়াছে, হইতেছে ও সংরক্ষিত হইতেছে। তাঁহার কি অপার শক্তি জ্ঞান কৌশল ও মহিমা!

যিনি এমন করিয়া সৃজন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তিনি অবশ্যই ইচ্ছাময় মহাব্যক্তি। নিজে ইচ্ছা করিয়া, জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া, অগ্রপশ্চাৎ সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অসীম শক্তিতে তেজেতে বিক্রম পরাক্রমে, ত্রুটীশূন্যভাবে অসীম নিপুণতার সহিত, তিনি সকলই করেন—এমন ব্যক্তি তিনি। তাঁহাকে সত্য-স্বরূপ বলিলে এ সকল কথাই তাঁহাকে বলা হয়। আদি কাল হইতে যে তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া সকলে স্তবস্তুতি করিয়া

আসিতেছে, তাহাতে স্পষ্টতঃই হউক বা প্রকারান্তরে হউক, তাঁহাকে এই সব কথাই বলিয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে আরও বলা হয় যে, তাঁহাতে কোনরূপ অসত্যের লেশমাত্র নাই। তিনি একেবারে পূর্ণ সত্যস্বরূপ। এখন একপ্রকার, তখন আর একপ্রকার, এভাব তাঁহাতে লেশমাত্র নাই। তিনি নির্ব্বিকার ও চিরদৃঢ়সংকল্প। একই ভাবে আপনার সংকল্পে অভিপ্রায়ে আপনি অবস্থিত। যাহাদের শক্তি অল্প, যাহাদের দুরদৃষ্টির অভাব, যাহারা নানা ভাবে বিচলিত, তাহারাই পরিবর্ত্তনের অধীন। কিন্তু অনন্ত পরমেশ্বর সে সকলের অতীত। তিনি নিত্য দৃঢ় অপার শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহারই উপর জীবের চির অব্যর্থ নির্ভর, এবং তাঁহারই আশা ও আশ্বাস সকলেরই আশ্রয়-স্থান। তিনি যে আশা মানব-প্রকৃতিতে রোপণ করিয়াছেন, তাহা চিরদিন নিশ্চয় পূর্ণ হইবেই হইবে। তিনিই জীবনের শান্তি, সাধুহৃদয়ের আনন্দ, সংসার-তাপে একমাত্র শীতল ছায়া। এই সত্যস্বরূপের উপর সকলেরই এমনি অটল নির্ভর।

মানব-হৃদয় এই চির অবস্থিত পরমেশ্বরকে দেখিতে চাহে, ধরিতে চাহে, উপলব্ধি করিতে চাহে; এবং সকলেই সাধারণতঃ মনে করে, অবাক্ হইয়া ভাবে, তিনি কোথায় ও কি রকম, তিনি আছেন বটে, কিন্তু কিরূপে আছেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহার মনের অবস্থা যেরূপ, সে সেইভাবে তাঁহাকে অনুভব করে। জড়ের সঙ্গে অধিকাংশ লোকেরই চিন্তা জড়িত, সুতরাং জড়ভাবে কল্পনা করাই অধিকাংশের পক্ষে সহজ। তাহারা ঈশ্বরকে জড়রূপে কল্পনা করে, এবং নরাকারে হস্তপদবিশিষ্ট দেহধারী দেবতা

মনে করে। আবার বিশ্বকর্ত্তার সৃষ্টিতে এই জড়েরই কত বৈচিত্র্য। উন্নত সুদৃঢ় পর্ব্বতদেহ হইতে নির্গত অতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণা অথবা আলোকময় দেহধারী পদার্থ আছে, এই সকল জড়পদার্থ; এ সকল রূপে মানুষ কখন না কখন তাঁহার কল্পনা করে। মানুষের আবার মনও আছে, আত্মাও আছে, জ্ঞান ধর্ম্ম, প্রেম পুণ্য পবিত্রতা শান্তি ইত্যাদিও আছে। এরূপেও তাঁহাকে কল্পনা করে। এ সকলই বিশ্ববিধাতার সৃষ্টি। তিনি স্বয়ং কোথায়? এ সকলেরই মধ্যে অপূর্ণতা জড়িত রহিয়াছে। তিনি পূর্ণস্বরূপ। মানবের উপলব্ধি করিবার শক্তি এ সকল পদার্থকে অতিক্রম করিয়া সহজে অগ্রসর হইতে পারে না, সেজন্য মানুষ তাঁহাকে ইহারই মধ্যে, কখন কোন পদার্থের মত, কখন অন্য এক পদার্থের মত অনুমান করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি "ইহাও নহেন, উহাও নহেন"। তিনি সর্ব্বাতীত, তাঁহার ঠিক ধারণা মানবশক্তির অতীত। কেহ তাঁহাকে বলিলেন, তিনি 'শূন্য' ও সেই শূন্যেরই স্তব আরাধনা হইল। কেহ তাঁহাকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করিলেন ও বলিলেন, অন্ধকার বিস্তৃত আধার। এইরূপে সেই সত্যস্বরূপকে নানাভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস মানবের মধ্যে, ভক্তসাধকের মধ্যে হইয়াছে। কতরূপে কতভাবে তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা হইয়াছে। এ সকলই কল্পনাপ্রসূত। তিনি যেমন, তিনি তেমনি, আপনার সত্তাতে আপনি অবস্থিত। ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিলে, তিনি মানবহৃদয়ে 'দর্শন' দেন; তখন দর্শক বলেন, এই যে তিনি, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বর্ণন করিতে পারেন না। কেবলই বলেন, অনির্ব্বচনীয় সত্তা, যাহা সৃষ্ট কোন

পদার্থের মত নহে, অথবা সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়, সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, সর্ব্বাপেক্ষা গুণশালী, সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে, অন্তরের অন্তরে, সর্ব্বকারণকর্ত্তারূপে বাহিরে, এবং সকলের বন্ধু ও আশ্রয়। পুরাকালে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য-প্রমুখ ঋষিরাও তাঁহার বর্ণনা এই ভাবেই দিয়া গিয়াছেন। এই ভাবেই তিনি আকুল চিত্তের নিকট প্রকাশিত হয়েন, এবং ইহাতেই মানব হৃদয়ের তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়া, ক্রমশঃই তাঁহার দিকে অনুধাবন ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর করে এবং প্রাণে পূর্ণ শান্তি, আনন্দ ও আশা সঞ্চার করে। এইরূপে সেই সত্যস্বরূপের উপলব্ধি হয়, দর্শন হয়, যিনি সর্ব্বসারাৎসার, সর্ব্ব-মূলাধার, সর্ব্বস্রষ্টা, নিয়ন্তা, পালনকর্ত্তা, বিধাতা ও সর্ব্বাশ্রয়। তাঁহাকে ঠিক দৃঢ়রূপে জানিতে হইলে, দেখিতে হইলে, সাধক একান্ত ব্যাকুলচিত্তে তাঁহারই নিকট প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তখন তিনি দর্শন দেন, আর সে দর্শন প্রকাশ করিয়া বলা যায় না, বর্ণনা করা যায় না।

ভগবানের সত্যস্বরূপতার সঙ্গে তাঁহার এই সৃষ্টির সত্যতা সংযোজিত রহিয়াছে। তিনি সত্য বলিয়া সমস্ত সৃষ্টি তাঁহা হইতে সত্যতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে যাহাকে আমরা অমঙ্গল (evil) বলি, তাহা আছে ; তবে কি তিনি সে অমঙ্গলেরও স্রষ্টা ? এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। উপযুক্তভাবে চিন্তা না করিলেই এই প্রশ্ন আইসে ; কিন্তু ভগবানেতে অমঙ্গল আরোপ কখনই করা যাইতে পারে না। কোন কোন শাস্ত্রে সৃষ্টির দুইটী কারণ দেখা যায়। একটী মঙ্গলের কারণ ঈশ্বর, অপরটী অমঙ্গলের কারণ "শয়তান"। এই দুইটীর মধ্যে চিরদ্বন্দ্ব বর্ত্তমান, সে শাস্ত্র বলে।

এবং যদিও শয়তান চিরদিন পরাস্ত হয় এবং সর্ব্বত্র মঙ্গলেরই জয় হয়, পরিণামে মঙ্গলই প্রবল হয়, তথাপি উল্লিখিত সংগ্রাম চির-দিনই থাকিয়া যায়। বিশেষ মগ্ন হইয়া না দেখিলে, এইরূপ চিন্তাই মানুষের মনে সহসা আইসে। কিন্তু ভাল করিয়া চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহার মধ্যে যে নিগূঢ় সত্য রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ পায়। জগতে আলোক ও উত্তাপ দিবার জন্য সূর্য্য আছে, কিন্তু অন্ধকার ও শৈত্য দিবার জন্য কিছু নাই, অথচ জগতে যেমন আলোক আছে, উত্তাপ আছে, তেমনি অন্ধকার ও শৈত্যও আছে। ইহার কারণ এই যে, প্রকৃত পদার্থ আলোক ও উত্তাপ, ইহারই অভাব অন্ধকার ও শৈত্য। অন্ধকার ও শৈত্য কোন প্রকৃত পদার্থ নহে। মঙ্গল আছে, অমঙ্গল তাহারই অভাব মাত্র। যাহা কিছু অভাব ঘটায়, তাহাই অমঙ্গলের কারণ। এ সংসারে সকলই অপূর্ণ। অপূর্ণ ভিন্ন পূর্ণ বা পূর্ণতাবিশিষ্ট কোন কিছু হওয়া সম্ভব নহে। একমাত্র পূর্ণ সেই অনন্ত পূর্ণস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম—সে ব্রহ্মতো আর দ্বিতীয় হয় না—তিনি একক একাকী। সুতরাং অপূর্ণতা সকল ব্যাপারের মধ্যেই রহিয়াছে। তাহা হইতেই অমঙ্গল উৎপন্ন হয়। তবে সেই পূর্ণব্রহ্মের ব্যবস্থায় সে সব অপূর্ণতার ফল ক্রমশঃই বিদূরিত হয় এবং জগতে পরিণামে মঙ্গলেরই জয় হয়।

সূর্য্য আলোক দেয়। কোন পদার্থ সম্মুখে আসিলে ছায়া পড়ে। সেই পদার্থ সেই আলোকের প্রতিরোধ করে। তাহাতেই সেই আলোকের অভাবে ছায়া অর্থাৎ অন্ধকার আইসে। আলোকই ব্যবস্থা, পদার্থ প্রতিরোধ করিল, তাহাতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল। শীতলতাও সেইরূপে উত্তাপের অভাবমাত্র। মানুষকে

ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। দুর্ব্বলতা অপূর্ণতা বশতঃ তাহা করিতে পারিল না, কাজেই পাপ উপস্থিত হইল। এইরূপে অপূর্ণতা বশতঃ সৃষ্টির পদার্থ সকল নানা অভাব আনয়ন করে, তাহাতেই অমঙ্গল, পাপ সংঘটিত হয়। সুতরাং এই অমঙ্গলের আর কোন কারণ নাই, এই সৃষ্ট বস্তুর অপূর্ণতাই তাহার কারণ। পূর্ণব্রহ্ম অমঙ্গলের কারণ হইতে পারেন না। অপূর্ণ বস্তুই ইহার কারণ। পূর্ণ ঈশ্বর এই সব অমঙ্গলের ফল সকলকে সর্ব্বথা সৃষ্টির মধ্যে নিষ্ফল করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই জন্যই পরিণামে মঙ্গলেরই প্রভাব বিস্তার পায়, অথচ অপূর্ণতা বশতঃ অমঙ্গলও থাকিয়া যায়।

সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ কেবল সেই এক অসীম অনন্ত ঈশ্বরই হইতে পারেন, অন্য কেহ হইতে পারে না। অন্য কোন বস্তুকে সেরূপ কল্পনা করিলে, সেই পূর্ণ ঈশ্বরেরই কল্পনা হইয়া পড়ে, সুতরাং এক ভিন্ন অন্য আর কিছু পূর্ণস্বরূপ হয় না, হইতে পারে না। অতএব সৃষ্টিকে অপূর্ণতাজড়িত হইতেই হইবে, এবং তাহাই হইয়াছে। এই জন্যই অমঙ্গলের সম্ভাবনাও রহিয়াছে। কেন এরূপ সৃষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তা করিলেন, তাহার কারণ তিনিই জানেন, ক্ষুদ্র মনুষ্য তাহা কি করিয়া জানিবে? তবে এই পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা হইয়াছে, তাহাতে অমঙ্গলের সম্ভাবনা সত্ত্বেও, মঙ্গলেরই প্রভাব রহিয়াছে—সুখ শান্তি আনন্দ নিত্য বিরাজ করিতেছে। এই সমস্ত হইতে আমরা প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারি যে, সৃষ্টিকর্ত্তা এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। তিনি সর্ব্বমূলাধার, সারাৎসার। সহজজ্ঞানের আভাসে আমরা তাহাই দেখি, সমস্ত তত্ত্ব আলোচনা করিয়াও তাহাই পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞান, শাস্ত্র সকল প্রকার তত্ত্বান্বেষণে যতই

পরিমার্জ্জিত হইতেছে, ততই সর্ব্বত্র একেরই সৃজনকার্য্য, স্থিতি-পালন, ব্যবস্থাই পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব একমেবাদ্বিতীয়ম্ যে ব্রহ্ম, তাহাই সহজজ্ঞানলব্ধ দর্শন ও বিশ্বাস। এবং তাহারই দিকে বিজ্ঞানের নিরূপিত সিদ্ধান্ত অগ্রসর হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর, খণ্ড খণ্ড দেবতা সব কেবল অলীক কল্পনা মাত্র। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেই একেরই কার্য্য; সেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়। পূর্ব্বে লোকেরা মনে করিতেন যে, সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর এক এক ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তা যেন নিযুক্ত আছেন; কিন্তু বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে, এরূপ ধারণা কেবল কল্পনা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এই ধারণানুযায়ী ব্যবস্থা কোথায়ও দেখা যায় না। সমস্তই এক অন্যের সঙ্গে এক নিগূঢ় যোগেতে আবদ্ধ, ইহাই প্রবলভাবে প্রতিভাত হইতেছে। আর তাহাই সঙ্গত। এক এক ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও তাহার পৃথক পৃথক শাসনকর্ত্তা কেবল অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা প্রতিপন্ন করে। মানুষ নিজে সমস্ত কার্য্য করিতে পারেনা, সেজন্য বিভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে; কিন্তু অনন্ত শক্তি যাঁহার, তাঁহার আর ইহার প্রয়োজন কি? তাঁহার কার্য্য, তাঁহার সৃজনকার্য্য, তাঁহার পালনকার্য্য, তাঁহার ব্যবস্থা যখন সকলই অসীম, অন্যের সহায়তার তখন বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন কি? সামান্য দুর্ব্বল জীব আমরা, আমাদের ন্যায় তাঁহার কার্য্যও নহে, তাঁহার আয়াসও নহে। তাঁহার বিশ্রামেরও প্রয়োজন নাই। অনায়াসে ইচ্ছামাত্র তাঁহার কাজ সুনিপুণ ভাবে সম্পন্ন হয়, তিনিই সম্পন্ন করেন। অনন্তের লীলাই এই। তাঁহার কার্য্য-কারিতাও যেমন আয়াসশূন্য, তাঁহার জ্ঞান চৈতন্যও সেইরূপ

১৬

চেষ্টাশূন্য, স্বয়ং উচ্ছ্বসিত। এইরূপে সেই একমাত্র সত্যস্বরূপ নিত্য অবস্থিত ও নিত্য কার্য্যকারী। বিজ্ঞান-শাস্ত্র নির্দ্দেশ করে যে, সৃষ্টির মধ্যে নিয়ম আছে, এবং সেই নিয়মই কার্য্য করে, সৃষ্টিকে বেশ সুশাসনে রাখে। ইহাও কল্পনা। বাস্তবিক কুত্রাপি কোনও নিয়মই অঙ্কিত নাই। সর্ব্বত্র সেই এককই স্বয়ং কার্য্য করিতেছেন; তিনি যে প্রণালীতে কার্য্য করেন, আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য বিজ্ঞান তাহাকেই নিয়ম বলে। নতুবা কোন নিয়ম জগৎকার্য্যে নাই। স্বয়ং সত্যস্বরূপ ঈশ্বরই সর্ব্বত্রই সৃজনে, পালনে ও সংরক্ষণে, আপনি পূর্ণশক্তিতে ও পূর্ণচৈতন্যে, প্রত্যেক কার্য্য করিতেছেন। সত্যস্বরূপ-সম্বন্ধে, সৃষ্টি সম্বন্ধে এই সুদৃঢ় সত্য।

এখন কথা এই, মানব-হৃদয় সহজেই জানিতে চায়, কেন তিনি এই অমঙ্গলের সম্ভাবনাপূর্ণ সৃষ্টি করিলেন এবং কোথা হইতে কি দিয়া সব সৃজন করিলেন। এ সব রহস্য ভেদ করা কি সামান্য মানব-জ্ঞানের পক্ষে সম্ভব? অনন্তই কেবল জানেন, তাঁহার নিজের লীলার মর্ম্ম ও অভিপ্রায়। জীব জন্তু সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহারা সুখ ভোগ করে, আনন্দ সম্ভোগ করে, শান্তিসুধা পান করে, সুখী হয়; আমরা তাহাতেই মনে করিতে পারি যে, জীবের মঙ্গলের জন্য, সুখসম্ভোগের জন্য তাঁহার সৃষ্টি-কার্য্য। কিন্তু এমন অনেক সামগ্রী সৃষ্টিতে রহিয়াছে, যাহাদের সৃজনের কারণ ও উদ্দেশ্য কি, ইহার নির্দ্দেশ কে করিবে? আমরা অবাক্ হইয়া কেবল দেখি ও শুনি এবং সম্ভবমত ভোগ করি; কিন্তু সৃষ্টির মূলতত্ত্ব—কেন এ সব হইল—কিছুই বলিতে পারি না। যদি সাধক নিজ জীবনোন্নতির প্রয়োজনের জন্য প্রকৃতরূপে এরূপ কোন

প্রশ্নের সমাধানের জন্য উৎসুক হয়েন, তিনি অতিপূতভাবে সেই জীবন্ত বিশ্বপিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, সম্ভবতঃ তাঁহার নিজ মঙ্গলসাধনোপযোগী উত্তর তথা হইতে লাভ করিবেন। নতুবা এ সকল বিষয়ের মীমাংসা এখনও মানব-বুদ্ধি-বিচারের সীমার বহির্ভূত। মানুষের পক্ষে এ সমাধান অসম্ভব হইয়া রহিয়াছে।

সত্যস্বরূপ কি উপাদানে সৃষ্টি করিলেন, ইহার মীমাংসা করাও দুরূহ। মানুষ কোন কিছু প্রস্তুত করিতে গেলে নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহা করে; কিন্তু অনন্ত সৃষ্টিকর্ত্তার সৃজন সেরূপে হয় নাই। উপাদান-সংগ্রহ তাহাতে নাই। কোথাও কিছু উপাদান নাই, তাঁহার ইচ্ছা হইল এবং সেই ইচ্ছা হইবামাত্র সৃজন হইল। কোথা হইতে সব আসিল, তিনিই জানেন—অসীম শক্তি কৌশল তাঁহার—আমরা তাহা বুঝিতেও পারি না, কল্পনাও করিতে পারি না। ব্রহ্মাণ্ডপতি আপনার অসীম শক্তিতে আপনি সৃজন করেন। আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, এই যে সৃষ্টি, ইহা আকস্মিক নহে। তিনি নিত্য সত্য ধ্রুব, পরিবর্ত্তন-বিহীন। সুতরাং এমন হইতে পারেনা যে, কোন এক সময়ে তাঁহার হঠাৎ ইচ্ছা হইল, আর সৃষ্টি হইল। ইহা হইলে কল্পনা করা হইল যে, কোন এক সময়ে সেই ধ্রুব অপরিবর্ত্তনীয়ের এক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। কেনই বা সে ইচ্ছা তাঁহার হইবে?—কোন অভাব অনুভূত হওয়ায় সে ইচ্ছা তাঁহার উদ্ভূত হইবে? তবে কি যিনি নিত্য পূর্ণ, কোনও সময়ে তাঁহারও অভাব বোধ হয়? এসব কল্পনা অসম্ভব। অতএব সত্যস্বরূপ নিত্য পূর্ণ ধ্রুবরূপে যিনি অবস্থিত, তাঁহার সৃষ্টিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য অবস্থিত। এই সৃষ্টিই

বর্ত্তমান সমস্ত সৃষ্টির মূলাধার। দর্শন-শাস্ত্র ইহার নাম 'প্রকৃতি' দিয়াছে। সেই আদি পুরুষের সঙ্গে এই 'প্রকৃতি' নিত্য বিরাজিত। ইহাতেই সৃষ্টির সমস্ত শক্তি—যাহা দেশে কালে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে—সৃষ্টিকর্ত্তার নিগূঢ় ইচ্ছায় প্রকাশিত হইতেছে—সংযোজিত হইয়া রহিয়াছে।

তবে এ 'প্রকৃতি' বস্তুটী কি? কোথা হইতে হইল? আমাদের বিজ্ঞান যত অগ্রসর হইতেছে, তাহার সঙ্গে ক্রমশঃ কত প্রকার মত এ বিষয়ে উপস্থিত হইতেছে। এক সময়ে বিজ্ঞান বলিয়াছে যে, সকল জড়পদার্থই অতিসূক্ষ্ম পরমাণু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে—সকল পদার্থই কেবল পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। এখন বিজ্ঞান অন্য প্রকার বলিতেছে। বর্ত্তমান মত এই যে, পরমাণু কিছুই নহে, কেবল শক্তির (energy) কেন্দ্রমাত্র। মনে হয়, ক্রমে ইহাই প্রতিভাত হইবে যে, এ শক্তি আর কিছুই নহে. কেবল সেই ব্রহ্মশক্তিরই রূপান্তর মাত্র। এরূপ হইলে সৃষ্টির উপাদান, প্রকৃতির মূলীভূত কারণ, সেই অনন্ত ব্রহ্মশক্তিরই রূপান্তর মাত্র, ইহাই প্রকাশ পাইবে। যদিও ব্রহ্মশক্তিরই রূপান্তর হয়, তথাপি সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম কৌশলে উহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক রূপে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সকল জীবই নিজকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া উপলব্ধি করে। ভগবানের যে কৌশলে ও গুণপণায় এই স্বাতন্ত্র্য সংগঠিত হইয়াছে, তাহা দর্শনশাস্ত্রে 'মায়া' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রকারে সেই সত্যস্বরূপের সৃষ্টিকার্য্যের সঙ্গে 'পুরুষ' 'প্রকৃতি' ও 'মায়া'র উল্লেখ করা হয়; কিন্তু এ'মায়া' কিছুই নহে, অলীক। সত্য-স্বরূপ অসীম দৃঢ় সত্য; সুতরাং 'মায়ারও' অসত্যতা নাই।

এই যে সৃষ্টি ও স্রষ্টা পৃথক রূপে পরিলক্ষিত হয়, ইহা সত্যই প্রকৃতি-রূপে পৃথক। স্রষ্টার শক্তির রূপান্তর হইতে সমুৎপন্ন হইয়া, সৃষ্টি কিরূপে সত্যই তাঁহা হইতে পৃথক হইল, ইহা তিনিই জানেন, সামান্য মানুষ আমরা তাহা ঠিক বুঝিতে পারিনা; কিন্তু তথাপি ইহাই সত্য, এবং সহজ-জ্ঞানের আলোকে এ সত্য আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। এ সত্যের উপলব্ধির অভাবে মানব হৃদয়ের সকল শান্তি শুকাইয়া যায়। বিশ্ববিধাতাকে প্রকৃতরূপে পিতা বলিয়া, মাতা বলিয়া, আশ্রয় বলিয়া সত্যই না দেখিলে, মানুষের মনের সুখ শান্তি আর কোথা হইতে আসিতে পারে।

এই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান, কিন্তু ইহার অবস্থিতিকে আকাশের অথবা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত বায়ুর, কিম্বা কোন বস্তুর অবস্থিতির সঙ্গে মিলাইয়া অনুমান করায় ভুল হইবে। এ সকল অবস্থিতি ভৌতিক অবস্থিতি; ইহারা খণ্ড, ইহাদের অংশ আছে। কিন্তু সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এক অখণ্ড অবস্থিতি, তাঁহার পক্ষে অংশ খাটে না। স্বয়ং তিনিই সর্ব্বত্র সমানভাবে একাই বিদ্যমান। ইহা আমাদের বুদ্ধি মনের ধারণার অতীত হইলেও, কিন্তু ইহাই সত্য। সেই একই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সর্ব্বত্র সমানভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। সকলের প্রাণের প্রাণ তিনি, শক্তির শক্তি তিনি, অন্তর্নিহিত বল তিনি; যাহার যাহা কিছু আছে, সকলেরই মূলাধার তিনি, ইহাই তাঁহার মহাব্যাপ্ত অবস্থিতি। আবার অপর পক্ষে সর্ব্বাতীত তিনি। সেই একই তিনি এইরূপ সর্ব্বনিহিত ও সর্ব্বাতীত (immanent and transcendent)। এই তাঁহার অবস্থিতি, আমাদের শক্তি সাধ্য অতিক্রম করিয়া তিনি রহিয়াছেন,

অথচ প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের বল শক্তি জীবন চেষ্টা তিনিই হইতেছেন। তিনি ভিন্ন আমরা বাঁচিনা, তাঁহার নিমেষের অন্তর্দ্ধানে আমাদের মহাবিনাশ উপস্থিত হয়। সূত্র যেরূপ উভয়দিকে থাকিয়া বস্ত্রের বস্ত্রত্ব দিতেছে, সূত্রগুলি টানিয়া পৃথক করিলে আর বস্ত্র থাকেনা; সেইরূপ তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব ও বিশ্বের সর্ব্বস্ব, অথচ বিশ্ব তাঁহা হইতে পৃথক। তিনি ইহাকে পৃথক করিয়া সৃজন করিয়াছেন। পাপী তাঁহা হইতেই বল পাইয়া পাপমুক্ত হয়, অথচ তিনি পাপীর সঙ্গে এক নহেন। ইহাই আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। সেইরূপ তিনিই সকল পদার্থের মূলীভূত বল শক্তি জীবন্ততা, অথচ তিনি স্বয়ং কিছুরই সঙ্গে এক নহেন। এই তাঁহার অন্তর্নিহিত ও সর্ব্বাতীত অবস্থিতি। বিশ্বাসী জন এই সত্যস্বরূপকে এইরূপে উপলব্ধি করেন।

তিনি আবার মঙ্গলময়—শিবম্। সহজজ্ঞানের যে আভাস আমরা পাই, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি সকলেরই আশ্রয়, সকলেরই হিত করিয়া থাকেন। সত্যস্বরূপ তিনি, আবার তিনিই কল্যাণ করেন। যেমন কোন সৌম্যমূর্ত্তি প্রশান্ত মহাজনকে দেখিবামাত্র অমনি মনে ভাব হয় যে, তিনি প্রকৃত হিতকারী জন, তেমনি সহজজ্ঞানের আভাস তাঁহাকে আমাদের নিকট হিতকারী বন্ধু বলিয়া দেখাইয়া দেয়। ক্রমে এই ভাব আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আরও স্ফূর্ত্তি পায়। ইহাতেই আমরা তাঁহাকে মঙ্গলস্বরূপ বলি। তিনি মঙ্গল ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন, মঙ্গল ভিন্ন অন্য কিছু করেন না। অনন্তরূপে তিনি মঙ্গল। কেবলই তাঁহার কার্য্য অপরের হিত সাধন করা, সকলকে সুখী করা। তিনি সেজন্য অনন্ত প্রেমময়,

মঙ্গলময় শিবম্—কেবলই কল্যাণ প্রদান করেন। আমরা বুঝি আর না বুঝি, তাঁহার কাজই এই। এইরূপে তিনি মঙ্গল-স্বরূপ।

বিশ্বময় যে বস্তুর যাহা কিছু গুণ শক্তি আছে, সে তাহা সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকট হইতেই পাইয়াছে। সত্যস্বরূপের সঙ্গে সকলের এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। জড় অচেতন পদার্থ আপন আপন অধিষ্ঠান ও গুণ সেই বিশ্বেশ্বরের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছে। ইহাই বিশ্বের ব্যবস্থা, তিনি এইরূপে বিশ্বময় তাঁহার কার্য্য নিরন্তর করিতেছেন। কিন্তু চৈতন্যবিশিষ্ট অনুভবশক্তিশালী পদার্থের সম্বন্ধে শুদ্ধ এ সম্বন্ধ চলে না। তাহাদিগকে সুখ দুঃখ দিতে হয়। তাহাদের সঙ্গে সৃষ্টিকর্ত্তার এজন্য আরও এক অন্য সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। তিনি তাহাদিগকে সুখী করিতে চাহেন, এইখানেই তাঁহার মঙ্গলময় ভাবের প্রকাশ প্রকাশিত হয়। অচেতনের নিকটে, সকলের নিকটে তিনি সর্ব্বস্রষ্টা ; কিন্তু সচেতনের কাছে আবার তিনি মঙ্গলময়। সেইই তিনি, যিনি জ্ঞান, শক্তি ও প্রাণ, তিনিই প্রেম, অহেতুক প্রেম। কেন তাহাদের সুখ দেন, কেবল এই জন্য যে, তিনি তাহাদের সুখী ও আনন্দপূর্ণ দেখিতে চাহেন। তাঁহার ভাল লাগে যে, তাহারা সুখী হয়। মা যেমন পুত্রের সুখ দেখিতে ভালবাসেন, সেই বিশ্ব-জননী তদ্রূপ সকলের সুখ দেখিতে ভালবাসেন। এই জন্য আমরা তাঁহাকে মঙ্গলময়ী জননী বলি।

যে আভাস সহজজ্ঞান প্রদান করে, তাহা সৃষ্টির কার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়। আমরা চারিদিকের পদার্থ ও বিষয় সকল দেখিয়া, তাহাই সম্পূর্ণ ঠিক, ইহা বুঝিতে পারি।

রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কোলাহলশূন্য হইল, জীবগণের বিশ্রামের ও নিদ্রার সুবিধা হইল। জীবগণ আরামে নিদ্রা যাইল। মঙ্গলময়ের এই ব্যবস্থা। বিশ্রাম পূর্ণ হইল, নিদ্রার অবসান হইল, প্রাতঃকাল আসিল, জীব সকল জাগরিত হইল, চক্ষু মেলিল, সূর্য্যের প্রাতর্জ্যোতি সকলকে আনন্দ দান করিল। সুশীতল সমীরণ সকলের শরীরকে স্নিগ্ধ করিল। চক্ষু খোলায় আনন্দ, শরীর ও অঙ্গ সঞ্চালনে আনন্দ, কার্য্য করিবার নবস্ফূর্ত্তিতে আনন্দ। এইরূপে আনন্দময় চারিদিক। আবার দিনের সঙ্গে সঙ্গে শরীর-ধারণোপযোগী ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ভোজনপান এবং সেই পরিতৃপ্তিতে পরম আনন্দ ও সুখ। কাহার ব্যবস্থা এ সমুদায়? জীব কি নিজে এ সব কিছু বুঝে? অসংখ্য অসংখ্য জীব এইরূপে জীবন কাটায়, কিন্তু জানে না ও বুঝে না, কোথা হইতে ও কেমন করিয়া এ সব সুখ স্বচ্ছন্দতা আইসে, কেইবা তাহার মূলে। সৃষ্টিকর্ত্তাই নিজপ্রেমে প্রত্যেকের শরীর মধ্যে বিহিত আয়োজন ও বাহিরে তদুপযোগী ব্যবস্থা করিয়া সকলকে নিরন্তর সুখদান করিতেছেন। যখন আমরা ভাবি, তিনি এ সব কেন করেন, তখনই বুঝি যে, তিনি মঙ্গলময়; তাহাতেই তাঁহার এ সব ব্যবস্থা ও আয়োজন। অগণ্য অগণ্য জীব বুঝে না, কেবল সম্ভোগ করে, মানুষেরই কেবল তাহা বুঝিবার শক্তি আছে—তাহাও কয়জন মানুষের আছে, কয়জনই বা সে বিষয়ে চিন্তা করে—সকলেই প্রায় সম্ভোগ করে মাত্র। যখন মানুষের হৃদয় মন উন্নত হয়, তখনই মন এ চিন্তায় মগ্ন হইয়া কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়। সুতরাং যিনি দিবার, তিনি অবিশ্রান্ত সুখ দিতেছেন; যাহারা ভোগ করিবার, তাহারা অন্ধভাবে ভোগ

করিতেছে। তিনিই প্রত্যেকের জন্য চিন্তা করিতেছেন, যাহার যাহা আবশ্যক, তাহা বুঝিয়া প্রত্যেকের জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন, আয়োজন করিতেছেন। চারিদিকের বিশ্বপ্রকৃতি ইহাই দেখাইয়া দেয় এবং প্রকাশিত করে যে, তিনি সত্যই মঙ্গলময় শিবম্। অহৈতুকী ভালবাসায়, কেবল নিজ প্রেমের গুণে, সকলেরই কল্যাণ তিনি অবিশ্রান্ত অসীম কৌশলে সাধন করিতেছেন। তিনিই অসীম গভীর প্রেমময়। সহজজ্ঞানের আভাসে, প্রকৃতির বিরামশূন্য কার্য্যদর্শনে, অভ্রান্তরূপে, তিনি যে দয়াময়, এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। তখন হৃদয় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠে, তিনি করুণানিধান, কৃপার অনন্ত সাগর। তিনি হৃদয়ের নিকট মধুরভাবে প্রকাশিত হয়েন, আর হৃদয় বলিতে থাকে—মধুরম্ মধুরম্ মধুরম্।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি তিনি দয়াময়, তবে সংসারে এত দুঃখ কষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে কেন? কত অনাথ বিধবার একমাত্র সন্তান—জীবনের অবলম্বন—অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। কতলোক রোগের দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে। কতলোক উপযুক্ত অন্নাভাবে কষ্টে দিনযাপন করে। কতলোক অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া গভীর মনোবেদনায় বিষাদচিত্তে কালহরণ করে। সহসা মনে হয়, বিধাতা দয়াময় হইলে, এ সব দারুণ ক্লেশ যন্ত্রণা দুঃখ দারিদ্র্য সংসারে বর্ত্তমান কেন?

এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বিশেষ যত্ন-সহকারে অনুশীলন আবশ্যক। আমাদের দেহ আছে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন রোগে আক্রান্ত। আমরা বুঝিতে পারি যে, দেহ এ সব রোগের আবাসের জন্য হয় নাই, নীরোগ হওয়ার জন্যই হইয়াছে।

রোগ আমাদের দোষের জন্যই আইসে, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার দোষে নহে। আমাদের নিজেদের, অভিভাবকদের কিম্বা সমাজের দোষেই রোগের উৎপত্তি। ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরকে রাখিতে পারিলে শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে থাকে। তখন আমরা বলিতে পারি, "সুখ-সাধন এ শরীর মন"। সৃষ্টিকর্ত্তা যে দেহকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাকে সুখ স্বচ্ছন্দতা দিবার জন্যই; আমরা আমাদের দোষেই রোগ আনয়ন করি। সকল ব্যাপারে সেইরূপই ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তা চাহেন ভাল, আমরা করিয়া তুলি মন্দ। মানুষের যে এত রোগ, দুঃখ, ক্লেশ ও বিষাদ, ইহার কারণ মানুষের নিজেরই ত্রুটী। স্বাধীনতা দিয়া বিধাতা মানুষকে একজন ব্যক্তি করিয়া সৃজন করিয়াছেন। এই স্বাধীনতা-বলেই মনুষ্য ধর্ম্ম লাভ করিবে, চরিত্র লাভ করিবে, উন্নত হইবে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু দুর্ব্বল অপূর্ণ মানব এই ইচ্ছা বুঝিতে সকল সময়ে সমর্থ হয় না। সুতরাং ত্রুটী ঘটে এবং সেই সব ত্রুটী হইতে নানা ক্লেশ ও কষ্ট উৎপন্ন হয়। সহিষ্ণুতার সহিত সেই দুঃখ ক্লেশের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে আবার তাহার উন্নতি হয়। এই কষ্ট দুঃখ মানুষের অপূর্ণ অবস্থায় অপরিহার্য্য। ইহা মানুষের ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট, আবার পক্ষান্তরে ইহাই মানুষের উন্নত হইবার জন্য উচ্চ অধিকার। অন্য জীবের এ ভূমণ্ডলে এ অধিকার নাই। সহসা মনে হয়, যদি কষ্ট ক্লেশ লইয়াই এ জীবন, তবে আর এ জীবন লইয়া মানুষের লাভ কি?—আর কেনই বা বিধাতাকে মঙ্গলময় বলিব? কিন্তু এই কষ্টক্লেশপূর্ণ জীবনই মানুষকে ক্রমশঃ মঙ্গলের দিকে লইয়া যাইতেছে, উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছে, সেই আনন্দের দিকে লইয়া

যাইতেছে, যে আনন্দ এ পৃথিবীতে অন্য জীবের ভোগে আইসে না, আসিতে পারে না, যে আনন্দ কেবল দেবতারাই ভোগ করেন। এই রহস্য মনুষ্যজীব-সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। ইহাই বুঝিলে মঙ্গলময় বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতে হয় ও তাঁহাকে পরম সুহৃদ্ বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না।

দুঃখে, কষ্টে ক্লেশ হয় বটে, এজন্য লোক ইহা পরিত্যাগ করিতে চাহে, এবং ইহা ঘটিলেই মানুষ ছট্‌ফট্ করে, বিধাতাকে মন্দ বলে; কিন্তু ইহার ভিতর নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। দুঃখ কষ্ট ক্লেশকর ও ভীষণ বটে, কিন্তু ইহা একেবারে অমঙ্গল নহে। আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাই, তাই ইহা আসিলে আমরা অধীর হইয়া পড়ি; কিন্তু ইহাতেও মঙ্গল আছে। তাই কবি বলিয়াছেন:—
"বিপদ্ কে বলে বিপদ্, ভাবিয়া দেখিলে পরে প্রকৃত সম্পদ্।"

দুঃখেতে মানুষের প্রথমতঃ এই চৈতন্য উদয় করিয়া দেয় যে, কোথায় তাহার ত্রুটী আছে। ত্রুটী ছাড়া তো দুঃখ আসে না, আর দুঃখ অনুভব করিলেই আমরা অনুসন্ধান করি, কেন উহা আসিতেছে, উহার কারণ কি, কোথায় কোন্ অভাবের জন্য উহার উৎপত্তি। ইহাতে আমরা আপনাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারি। এ অবস্থা না বুঝিলে নিজেদের উন্নতি-সাধন সুদৃঢ় হইতে পারে না। এইটি বুঝিবার পক্ষে দুঃখ সহায়। দ্বিতীয় কথা এই যে, দুঃখ মোচন করিবার জন্য চেষ্টা হয়। যদি দুঃখ দুঃখজনক না হইত, কষ্টকর না হইত, তাহা হইলে তাহা মোচনের চেষ্টা আসিত না। সুখ পাইলে কে আর তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করে? দুঃখকে কষ্টকর করিয়া মানুষকে চেষ্টায় উদ্যমে নিক্ষেপ করা হয়। ইহা না থাকিলে মানুষ নিশ্চেষ্ট

হইত, অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইত। সুতরাং দুঃখ মঙ্গলকর। তৃতীয় কথা এই যে, দুঃখে পড়িলে মানুষের চরিত্র উপযুক্তরূপে গঠিত হয়। দুঃখের ভিতর দিয়া মানুষ ধীর শান্ত হইতে শিক্ষা করে। দুঃখে অনেক বিষয় মানুষের জীবনে নিগূঢ়রূপে অনুভূত হয়, এবং সেই অনুভূতি হইতে চরিত্রের গাম্ভীর্য্য আসে, যাহা দুঃখ না হইলে হয় না। যাহারা নিরন্তর সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, তাহাদের জীবন এক প্রকার লঘু, চঞ্চল ও অনেকাংশে নিগূঢ়-পরিণাম-অদর্শী থাকিয়া যায়। যে জননী সন্তানের মঙ্গল চাহেন ও সন্তানের পক্ষে প্রকৃত মঙ্গল কি বুঝেন, তিনি কি নিজ সন্তানকে এরূপ থাকিতে দিতে পারেন? তাই সেই পরম অনন্তমঙ্গলময়ী জননী সংসারে দুঃখ আনিবার ব্যবস্থা সন্তানদের মঙ্গলের জন্যই করিয়াছেন। অতএব দুঃখ ক্লেশ আপাততঃ দৃষ্টিতে মন্দ মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে মন্দ নহে, কিন্তু কল্যাণেরই মূলীভূত কারণ। মানুষ তাহা প্রথমতঃ বুঝিতে পারেনা বলিয়াই ব্যস্ত হয়। কিন্তু অনন্তমঙ্গলময়ী অনন্তজ্ঞানময়ী জগজ্জননী জানিয়া শুনিয়াই, তাহাতে প্রকৃত মঙ্গল জানিয়াই, মনুষ্যের জীবনে এই দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং ইহাতেই প্রকৃত কল্যাণ সাধন করাইতেছেন। মানুষ প্রথমে কষ্টের পেষণে ছটফট করে, কিন্তু তদ্দ্বারা যতই তাহার জীবন উন্নত হইতে থাকে, বুদ্ধি বিবেচনা পরিপক্ক হইতে থাকে, ততই ইহার উপকারিতা দেখিতে থাকে, তখন সেই পরমজননীর মঙ্গলময় নাম কীর্ত্তন করিতে থাকে।

দুঃখকষ্টের উৎপত্তি মানবের নিজ ত্রুটীসম্ভূত হইলেও, উহা ক্লেশকর এবং যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক। উহা হইতে উপকার লইতে হইবে। যিনি মঙ্গলময়ী জননী; তিনিই আবার ব্যবস্থা করিবেন,

যাহাতে সেই যন্ত্রণা ক্লেশ যতদূর সম্ভব লঘু হয়। রোগ হইবে, কিন্তু তাহার প্রতিকারের কতই না ব্যবস্থা—কত ঔষধপত্র। এই ঔষধপত্র আগে হইতেই মৃত্তিকাগর্ভে ও উদ্ভিদ্‌রাজ্যে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার তাহার সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শাস্ত্র মানবের মধ্যে নিহিত শক্তির দ্বারায় উদ্ভূত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, যদি ক্লেশ স্থায়ী হয়, অভ্যাসবশতঃ তাহার তীব্রতার লাঘব হয়। ইহাও তাঁহার এক বিধি। প্রতিকারের সম্ভাবনা যখন আর না থাকে, তখন পরিণামে মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করে।

দুঃখকষ্ট আসিলে তাহার কল্যাণকর শাসন ও মঙ্গলপ্রদ ফলও পূর্ণভাবে লইতে হইবে। এদিকে আবার ত্রুটী হইলে বিবিধ অনিষ্টের সম্ভাবনা। শারীরিক দুঃখকষ্ট হইলে যেমন একদিকে প্রতিকারের ব্যবস্থা ও অন্যদিকে তাহার মধ্যে যে কল্যাণ আছে, তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে, এই বিধি, সেই প্রকার মানবের অন্যান্য কষ্ট যন্ত্রণার পক্ষেও সেই একই প্রকার বিধি। এবং আশ্চর্য্যরূপে ইহাতেই বিধাতার অনন্ত ন্যায় ও প্রেমের পূর্ণ রক্ষণ সম্পাদিত হইতেছে, এবং ধর্ম্মরাজ্যের নিত্যজয় সম্পন্ন হইতেছে।

সর্ব্বদা সুখসম্ভোগই মঙ্গলকর, ইহাই সহজে আমাদের মনে হয়, এবং যে আমাদের সর্ব্বদা সুখ দেয়, তাহাকেই আমাদের হিতকারী বন্ধু মনে করি। কিন্তু জগতের সুখই সর্ব্বস্ব নহে, কষ্ট ক্লেশেরও প্রয়োজন আছে, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র শিশু কেবল মিষ্ট খাইতে চাহে। তাহাতে তাহার পীড়া হইবে সে তাহা বুঝে না। তাহার মঙ্গলের জন্য কিন্তু মাতা মধ্যে মধ্যে

তাহাকে তিক্তদ্রব্য খাইতে বা পান করিতে দেন। শিশু তাহা খাইতে বা পান করিতে চাহে না, ক্রন্দন করে; কিন্তু মঙ্গল হইবে বলিয়া মাতা শিশুকে জোর করিয়া তাহা খাওয়ান। সেইরূপ জগজ্জননী নিজ সন্তানগণকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, কারণ পরিণামে তাহা হইতে মঙ্গল হইবে। জগতে সকলে কেবল সুখেই থাকিতে চাহে, কিন্তু কোন না কোন রকমে দুঃখ আসেই আসে। সকলে সেই জন্যই বলে যে, সংসার দুঃখেরই আগার। কিন্তু এ কষ্ট দুঃখ জীবনকে মার্জ্জিত ও উপযুক্ত করিবার জন্য—সেই ভাব, সেই গঠন দিবার জন্য, যাহাতে তাহার যথার্থ সুখ ও শান্তি নিত্য ও স্থায়ী হয়, এবং দুঃখের কারণ ক্রমে সমূলে বিদূরিত হয়—দুর্ব্বল প্রকৃতি সবল হয়, অপূর্ণতা ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। জীব তাহার অল্পজ্ঞানে তাহা বুঝিতে পারে না, জানিতে পারে না, দুঃখেতেই অভিভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু জগজ্জননী তাঁহার অনন্তজ্ঞানে সকল জানিয়া বুঝিয়া কাহারও বিচারের অপেক্ষা করেন না, নিজে যাহা ভাল বুঝেন এবং অব্যর্থরূপে জানেন, তাহাই ব্যবস্থা করেন। জীবের উপর এই ভাবে কষ্ট দুঃখের শাসন আইসে। পরে যখন চৈতন্য উদয় হয়, তত্ত্ব সকল বুঝিতে পারে, তখন এই দুঃখ কষ্টেরই জন্য বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মঙ্গলময় জননীর কার্য্যধারা এইরূপ।

কোন কোন ভৌতিক ঘটনা এমন আছে, ব্যবস্থাও এমন আছে যে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা যায় না। তাহা দেখিলে হঠাৎ মনে এই ভাব উঠে যে, দয়াময়ের রাজ্যে এরূপ কেন হয়। এই সকল ঘটনা লইয়া অল্পবিশ্বাসী যাহারা, তাহারা ভগবান্‌কে অনন্ত

করুণাময় বলিতে একেবারে নারাজ। সর্ব্বদাই আমরা দেখি যে, এক জীব অন্য জীবকে ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে। এই বিধি জগদ্ব্যাপী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভূচর, খেচর, জলচর সকল প্রাণীর মধ্যেই এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। যাহারা জীব ভক্ষণ করে না, তাহাদের উদ্ভিদ্ ভক্ষণ না করিয়াও উপায়ান্তর নাই। আবার কত আকস্মিক ভূমিকম্পে, কত দাবানলে, কত জীব, কত প্রাণী বিনষ্ট হয় বা কষ্টে পড়ে, তাহার সংখ্যা কে করে! আকস্মিক জলপ্লাবনেও কত প্রাণী প্রাণ হারায়। এ সকল দেখিয়া মন কাঁপিয়া ওঠে ও বলে, দয়াময়ের রাজ্যে এরূপ কেন হয়। হতভম্ভ হইয়া ইহাই ভাবে! ইহার কারণ ও উদ্দেশ্য কিছুই ঠিক করিতে পারে না। তাঁহাকে দয়াশূন্য ও নিষ্ঠুরও তাহারা মনে করিতে পারে না, কারণ তাঁহার করুণাগুণে সকলেই প্রতিনিয়ত প্রতিপালিত হইতেছে। যে জীবকে অন্য জীব ভক্ষণ করিতেছে, সেই জীবের বিনাশপ্রাপ্তির পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার প্রাণ তাঁহার অসীম দয়াতে পালিত হইয়াছে দেখা যায়। ইহা দেখিলে তাঁহাকে নির্দ্দয় বলাও চলে না। তিনি নির্দ্দয় নহেনই। তিনি দয়াময়ই, মঙ্গলময়ই, এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকিয়া যায়। তবে কেন এরূপ নিদারুণ ব্যবস্থা জগতে রহিয়াছে, বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। হয়ত এই সকল ঘটনা দ্বারা, তিনি নিজ গুণের অপর এক দিকের ভাবের পরিচয় দিতেছেন। আমাদের সহজে ধারণা হয় যে, যিনি দয়াময়, তিনি নিরীহ-প্রকৃতি, শান্তস্বভাব, তাঁহাতে রুদ্রভাব কিছুই নাই। সকলকে কেবল সুখই দেন, দুঃখ দিতে যেন তিনি জানেন না, দুঃখ দেখিলেই যেন গলিয়া পড়েন।

দুঃখের দৃশ্য দর্শন করা অপেক্ষা যেন তিনি দূরে পলায়ন করেন। প্রেমময় বলিলে, সাধারণতঃ এই সকল ভাব মনে আইসে। কিন্তু বিশ্বপতি যে 'ভয়ানাম্ ভয়ম্' 'ভীষণম্ ভীষণানাম্'; তাঁহার সেই রুদ্রভাব প্রকাশের একপন্থা এই সকল ঘটনা? কে ইহার নির্ণয় করিতে পারে! আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমরা এ সকল ঘটনা দেখিয়া স্তম্ভিত হই, এবং এই মাত্র তাঁহাকে বলি যে—"তুমি অপার অগম্য, তোমার লীলা, তোমার মহিমা কে বুঝিবে? আমরা তোমার প্রকাশের তত্ত্ব বুঝিতে পারি না। তুমি যেমন অসীম প্রেমময়, তেমনি আবার তুমিই কঠোর রুদ্ররূপধারী। শত শত জীবের জীবন নিমিষে নাশ করিতেও তোমার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হয় না। তুমি নিমেষে যেমন সৃজন কর, সুখ দাও, অসীম সুখ দাও, আবার তেমনি তোমার ইচ্ছা হইলে, তুমি নিমেষের মধ্যে ধ্বংসও করিতে পার ও কর। তুমি মায়া মমতার অধীন নও, মোহে মুগ্ধ হও না। তুমি যেমন অসীম ভালবাসায় ভালবাস, আবার তেমনি নির্ম্মমও হইয়া ধ্বংস কর—'ভাঙ্গ গড় ডুবেলা'।"

এই সকল ঘটনারাজী যেন বিধাতার নানা স্বরূপেরই পরিচয় দিতেছে। আমাদের নিকট এ সকল যেন প্রকাশ করিতেছে যে, তাঁহার চরিত্রের কোমল দিকও যেমন আছে, আবার কঠিন দিকও তেমনি আছে। কেবল কোমলতা নিরীহতাই ভ্রমধারণাবশতঃ প্রিয়-জ্ঞানে অবলম্বন করিবনা, কিন্তু বিক্রমের, বলের, রুদ্রতার, কঠোরতার দিকও আমাদের চরিত্রে অবলম্বন করিব। সমস্ত ভাবকে চরিত্রের মধ্যে সমাবেশ করিয়া জীবন পূর্ণ করিব। কে জানে, এই শিক্ষাই তিনি এই সকল ঘটনা দ্বারা আমাদিগকে দিতেছেন কি না।

তাঁহার নিকট সৃজন পালন ও ধ্বংস বিনাশ সকলই আয়াসহীন। যেমন অসীম দয়ায় রক্ষাও করেন, তেমনি নির্দ্দয়ভাবে ধ্বংসও করেন। কিন্তু যাহাকে বিনাশ করেন, যতদূর সম্ভব তাহার কষ্ট না হয়, তাহারও বিধান করেন; সেখানেও তাঁহার অসীম দয়ার পরিচয় দেন। অতএব আমরা তাঁহাকে দয়াময় ভিন্ন আর কিছুই জানি না, বা ভাবিতে পারি না। তিনি যে অনন্ত মঙ্গলময়, মানব-হৃদয় তাহাই চিরদিন অনুভব করে ও বিশ্বাস করে; এবং যতই জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ততই আপাততঃ অকল্যাণকর যাহা মনে হয়, তাহা পরিণামে মঙ্গলেরই নিদর্শন বলিয়া প্রতিভাত হয়।

পাপীর পাপমোচন বিষয়ে সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাবেরই অন্যতর প্রকাশ। মনুষ্যের হিতের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি বিধান করিয়াছেন, কোন দিকে কোন ত্রুটীই রাখেন নাই। এমন কি, অনেক সময় অনেক মানুষ মনে করেন যে, তিনি সবই দিয়া রাখিয়াছেন, মানুষ আপন চেষ্টায় তাহা হইতে আপনার সুখ-সাধনের সম্পূর্ণ উপায় করিয়া লউক—মানুষ তাহা করে তো শুভ ফল ভোগ করে—না করে তো নিজেই কষ্ট ভোগ করে, তিনি আর মানুষের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কিছু করেন না। এ মত যেমনই হউক, ইহাতে এই প্রকাশ পায় যে, বিধাতার ব্যবস্থাতে কোন ত্রুটী নাই, মঙ্গলময় মঙ্গলভাবে সমস্তই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, কোন ত্রুটীই রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহার ব্যবস্থা যখন পূর্ণ, মানুষ নিজ স্বাধীন ইচ্ছায় যদি তাহা লঙ্ঘন করে, তাহার ফল সে নিজেই ভুগিবে, তিনি আর কি করিবেন। যদি সত্যই তিনি এইরূপে মানুষকে ছাড়িয়া দিয়া নিজে নিরপেক্ষ হইয়া তফাৎ

থাকেন, তাহা হইলে মানুষের অবস্থা পরিণামে কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহার ঠিকানা থাকে না। দুর্ব্বল বোধহীন মানুষ সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কি করিতে কি করিয়া ফেলে; এমন অবস্থায় মানুষ ক্রমাগত বিভ্রাটের পর বিভ্রাটে, কষ্টের পর কষ্টে পড়িয়া, মহা যন্ত্রণার মধ্যে আসিয়া পড়ে। কে আর তখন তাহাকে নিস্তার করিবে! কিন্তু দয়াময় কি সেই-রূপ হইতে দিতে পারেন? তিনি কি ইহা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহার প্রেম যে তখন উথলিয়া উঠে। তিনি তাই তখন ঐ সব ব্যাধির প্রতিকার আনিয়া দেন। প্রথমে সবই মানুষকে দিলেন, কিন্তু মানুষ সে সব বজায় রাখিয়া, আপনার মঙ্গল-সাধনে সমর্থ হইল না। তখন আবার তিনি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাকে প্রকৃত পথে আনেন। তাহার পাপ-ব্যাধির ঔষধ প্রয়োগ করেন, যাহাতে তাহার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। এই তাঁহার রীতি। মানুষ বার বার পথভ্রষ্ট হয়, সেজন্য সে কষ্টভোগ করে, তাঁহার হস্তে দণ্ড পায়; আবার বারবার তিনি মানবের কল্যাণের জন্য সুব্যবস্থাও করিয়া দেন, তাহার কল্যাণের পথ খুলিয়া দেন। তাঁহার প্রদত্ত দণ্ড হইতে সে পথ খুলিয়া থাকে — ইহাও সেই অসীম; কৌশলময়ের কৌশল। তিনি যে দয়াময়, এখানেও সেই দয়ারই পরিচয়।

তাঁহার এরূপ দয়া না থাকিলে, পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য, পাপ-মোচনের জন্য পাপী কোথায় যাইত? কে আর তাহার উদ্ধার করিত? বিশ্বজগতে তিনি ছাড়া কে আর আছেন, যিনি যথার্থতঃ পাপী জনের পাপ মোচন করিতে পারগ? একমাত্র

সেই সর্ব্বপাপহারী পতিতপাবন শ্রীহরিই পাপ মোচন করিতে সমর্থ। অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ পুরুষ তাই দয়া প্রকাশ করিয়া নিজ পুণ্যবলে ইহ পরলোকে সকল পাপীর পাপ মোচন করিয়া দেন—পাপীকে পুণ্যবান্ করেন—পবিত্রতার পথে, শুদ্ধতার পথে, আনন্দের পথে লইয়া যান। এই তাঁহার রীতি, এই তাঁহার বিধি। করুণাময় এইরূপে নির্ব্বিশেষে সকলের উপর করুণা বর্ষণ করেন।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বাল্যজীবন।

কলিকাতা হইতে ৩।৪ ক্রোশ উত্তরে, ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পারে, বালী-উত্তরপাড়ার নিকটবর্ত্তী কোতরং নামে পল্লীগ্রামে, ইং ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ৬ই তারিখে, নিবারণচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি তাঁহার বাল্যজীবনের স্মৃতিলিপি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

তাঁহার বাল্যজীবন অত্যন্ত পাড়াগাঁয়ে যাপিত হয়। সে সময়ে কলিকাতার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী পাড়াগাঁয়েও কোন উন্নতির তাদৃশ চিহ্ন ছিল না। কোতরং গ্রামে মোটে তখন ১২।১৪ ঘর ব্রাহ্মণ এদিক ওদিক বিশৃঙ্খল ভাবে বাস করিত; কায়স্থ মোটে এক ঘর, তাহাও নবাগত ছিল। এক ঘর গোপ, ২।৩ ঘর সদ্‌গোপ ঘোষ, কয়েক ঘর চাষী ঘোষ, এক ঘর বাগ্দী, এক ঘর কামার, এক ঘর কলু অর্থাৎ তৈল-ব্যবসায়ী এবং কিঞ্চিৎ দূরে ৪।৫ ঘর চণ্ডাল ও উহাদের এক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিত। আরও দু' পাঁচ ঘর লোক এদিক ওদিক সে গ্রামে বাস করিত। এক ঘর কি দুই ঘর ব্রাহ্মণ ছাড়া এবং দুই একজন গোয়ালা ও ঘোষ ছাড়া কাহারও অবস্থা ভাল ছিল না। মনে হয়, কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল,

কিন্তু তখন মন্দ হইয়া গিয়াছিল, এবং সেজন্য তাঁহাদের পূর্ব্বেকার পাকা ঘর এবং বড় বড় বাগান ও পুষ্করিণী ক্রমে সব জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কোনও চাষারই সুবিস্তৃত চাষকার্য্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। অনেকেই পাটের লম্বা লম্বা দড়ি প্রস্তুত করিত, এবং অনেকেই বড় বড় কাঠের তাঁত বসাইয়া, তাহাতে পাটের দড়িতে চটের থান বুনিত। এ সকল চটের থান কলিকাতায় লইয়া যাইয়া বিক্রয় করিত। এক আধ জন ইতর লোক কিছু কিছু কণ্ট্রাক্টারী কাজ করিয়া, অবস্থা কিছু সচ্ছল করিয়াছিল। এইরূপে লোকেদের আর্থিক অবস্থা নিতান্তই মন্দ ছিল। গ্রামে এক ঘর বৈদ্য কবিরাজ ছিল; তাঁহাদেরও অবস্থা তাদৃশ ভাল ছিল না। গ্রামে কোনও স্কুল কি বিদ্যালয় ছিল না, মাঝে মাঝে দুই একটী পাঠশালা ছিল, যেখানে বর্দ্ধমান জেলার আগুরি-জাতীয় গুরুমহাশয়েরা ভদ্রলোকেদের ছেলেদের তালপাতায় ও কলাপাতায় বাঙ্গালা লিখিতে শিখাইতেন। তাহা ছাড়া হিসাব করিতে ও কিছু কিছু পড়িতে শিখাইতেন। ভদ্রলোকের ছেলেদের সঙ্গে কখন কখন দু'একজন চাষাদের ছেলেরাও পড়িত। পুরাতন প্রথা অনুসারে লোকেরা পালপার্ব্বণ অবস্থা অনুসারে সম্পন্ন করিত বটে, কিন্তু বিশেষ কোন আমোদ আহ্লাদের ব্যাপার ছিল না। কেবল কখন কখন লোকেরা একত্র হইয়া বারোয়ারি পূজা করিত; তখন কলিকাতা হইতে যাত্রার দল লইয়া যাইত, এবং সেই উপলক্ষে দু'তিন দিন গ্রামে ধূমধাম পড়িয়া যাইত।

হাওড়ার নিকট শিবপুর হইতে যে বড় পাকা রাস্তা (Grand Tiunk Road) প্রায় গঙ্গানদীর সমান্তরালভাবে চলিয়াছে, তাহা

কোতরং গ্রামের ভিতর দিয়া গিয়াছে। ভাগীরথী নদী তাহার পূর্ব্বদিকে বহমানা। গ্রামটী প্রধানতঃ তাহার পশ্চিম দিকে। নদী ও রাস্তার মধ্যস্থিত জমি অধিকাংশ স্থলেই বর্ষাকালে জলমগ্ন হইত, কাজেই লোকের বসবাস উচ্চভূমি ব্যতীত অন্যত্র ছিল না। গ্রামের পশ্চিমে ও কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে জলা জমি ছিল। তাহাতে আবাদ হইত। ঐ জমির মধ্য দিয়াই পরে রেলপথ (East India Railway line) প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ বড় রাস্তা হইতে গ্রামের ভিতর উহার মধ্যে বড় বড় ৩।৪টী কাঁচা রাস্তা ছিল; তাহা ও তাহা হইতে নির্গত গ্রাম্য সরণী দিয়া লোকেরা গমনাগমন করিত। এই সব রাস্তা অতি কদর্য্য ছিল। রাস্তাগুলি বর্ষাকালে কর্দ্দমপূর্ণ হইত ও তাহাদের মাঝে মাঝে গর্ত্ত হইত। লোকের চলাফেরা দুষ্কর হইত। গ্রাম্য লোকেদের যেন ধারণাই ছিল না যে, রাস্তাগুলি মেরামত করিলে নিজেদেরই সুবিধা হইবে; কাজেই কেহ কখন মেরামত করিত না। তবে গ্রামটী নিরীহ ছিল; লোকেদের দুষ্ট অভিসন্ধি কিম্বা চক্রান্ত বুদ্ধি ছিল না। গ্রামে দুই একজন দুষ্ট গুণ্ডা লোক ছিল; তাহাদের লোকেরা ভয় করিত। জলাভূমির নিকট একটা বড় পুকুর ছিল; তাহাকে "হ্যাবাই" পুকুর বলিত ও তাহার উচ্চ পাড়কে 'হ্যাবাই আড়া' বলিত। বৎসরের মধ্যে কখন কখন এখানে মাছ ধরা হইত; জল ক্রমে শুকাইয়া আসিতে ছিল, সেজন্য জাল দিয়া মাছ ধরিতে হইত না। পোলো কিম্বা শুধু হাত দিয়াই ধরিত। গ্রামের লোকেরা মাছ বণ্টন করিয়া লইত।

এই ত গ্রাম্য জীবনের অবস্থা ছিল। দেশের উন্নতি কিসে, অধোগতি কিসে. সে বিষয়ে • কাহারও চিন্তা যাইত না।

ছেলেপিলেদের কি শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহাও কেহ বুঝিত না। পাঠশালায় 'শিশুশিক্ষা' পুস্তক পড়ান হইত, অর্থাৎ তাহার কবিতা-গুলি মুখস্থ করান হইত। নিবারণচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে 'Murray's Spelling Book' এবং 'New Spelling Book' পড়াইতেন। তিনি কখন কখন নিবারণচন্দ্রকে লইয়া বসিতেন, এবং spelling মুখস্থ করিতে দিতেন। তাহা মুখস্থ করিতে না পারিলে মার খাইতে হইত। তখন তিনি ছুটিয়া পলাইয়া যাইতেন। এইত শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল। চারিদিক যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই অবস্থার মধ্যে নিবারণচন্দ্র লালিতপালিত হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (Rev. K. M. Banerjee) নিবারণচন্দ্রের মাতামহ ভুবনমোহনের মধ্যম সহোদর-ভ্রাতা ছিলেন। ভুবনমোহন, কৃষ্ণমোহন ও কালীমোহন তিন ভাই। মধ্যম কৃষ্ণমোহন ও কনিষ্ঠ কালীমোহন উভয়েই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। জ্যেষ্ঠ ভুবনমোহন হিন্দুসমাজেই রহিয়া যান। কলিকাতায় গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে এই তিন ভ্রাতার একটী একতালা ইষ্টক-নির্ম্মিত বাড়ী ছিল। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সে সময়ে উক্ত ভ্রাতারা এ বাটীতে বসবাস করিতেন না। ভুবনমোহনের পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। অপর দুই ভাই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন। উভয়েই শিবপুরে Bishop's Collegeএ কার্য্য করিতেন ও সেইখানেই থাকিতেন। এই বাড়ীই পরে দান ও ওয়ারিশ সূত্রে নিবারণচন্দ্র পান। ইহার কিয়দংশ নিবারণচন্দ্র দ্বিতলে পরিণত করেন, এবং পরে

নিবারণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্মুখভাগ ভাঙ্গিয়া সেখানে নূতন দ্বিতল ঘর নির্ম্মাণ করেন।

নিবারণচন্দ্রের মাতা তাঁহার পিতার একমাত্র সন্তান বিধায়, নিজ মাতুলালয়ে কোতরং গ্রামে থাকিতেন, এবং তাঁহার কলিকাতাস্থ পৈত্রিক বাড়ী অতি অল্প ভাড়ায় (৬৲।৭৲ টাকা মাসিক) ভাড়া দেওয়া হইত। ভাড়ার টাকা নিবারণচন্দ্রের মাতা পাইতেন। তাহা ছাড়া মাসে মাসে ২৲।৩৲ টাকা Rev. K. M. Banerjee মহাশয়ের নিকট হইতে পাইতেন। নিবারণচন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। নিবারণচন্দ্রের পিতামাতাকে এই সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই সংসার চালাইতে হইত। নিবারণচন্দ্রের পিতা Rev. K. M. Banerjeeর নিকট গিয়া তাঁহার মাসিক দানের টাকা আনিতেন। একবার যখন তিনি এইরূপ গিয়াছিলেন, তখন Rev. K. M. Banerjee বলেন যে, নিবারণচন্দ্রকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া আবশ্যক। নিবারণচন্দ্রের পিতার এ সব বিষয়ে কোন চিন্তাই ছিল না। সুতরাং কি প্রকারে পুত্রকে স্কুলে পাঠাইবেন, তাহা জানিতেন না। সেজন্য Rev. K. M. Banerjee মহাশয়, উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পূজার্হ স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নামে একখানি পত্র নিবারণচন্দ্রের পিতার হস্তে দেন। এবং পরে স্কুলে পরিয়া যাইবার উপযোগী বস্ত্রাদিও পাঠাইয়া দেন। এই অবস্থায় ইং ১৮৫৪ সালের জুন মাসে নিবারণচন্দ্র উত্তরপাড়ার স্কুলে সর্ব্বনিম্নশ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। সেখানে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, সিপাহী বিদ্রোহের (Sepoy Mutinyর)

পর, কলিকাতার হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইং ১৮৫৯ সালে ভর্ত্তি হন।

তিনি বাল্যজীবনের মধ্যে, একটী ঘটনার বিষয় এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—"এই বাল্যজীবনের মধ্যে একটী কথা আমার বিশেষ স্মরণ হয়। সেটী এই। আমি যখন স্কুলে অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমার শ্রেণীর অন্য একটী বালক একখানি ছেঁড়া পুস্তক, যাহার মলাট ও সামনের পাতা কিছুই ছিল না, আমার নিকট বিক্রয় করিবে বলিয়া আমায় দেখায়। পুস্তকখানি ইংরাজি বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠ্য-পুস্তক, তাহাতে A B C ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া বানান শিখান ছিল এবং সামান্য সামান্য ইংরাজি কথা ও ইংরাজি হইতে বাঙ্গলা ও বাঙ্গলা হইতে ইংরাজি কথা বলিবার বিষয় শিক্ষা দেওয়া ছিল। যে ছেলেটী এ পুস্তকখানি আমাকে দেখায়, সে বলিল যে, পুস্তকের দাম ছয় পয়সা। আমি অতি গরিব বালক ছিলাম। আমার পক্ষে এ দামও বেশী ছিল। তথাপি প্রতিদিন যে একটী করিয়া পয়সা স্কুলে জল খাইবার জন্য পাইতাম, জলখাবার না খাইয়া ঐ পয়সা সঞ্চয় করিয়া দাম দিয়া পুস্তকখানি ক্রয় করিয়াছিলাম, এবং অতি যত্নে সেই পুস্তকখানি বরাবর রাখিয়া দিয়াছিলাম। যখন কলি-কাতায় আসিলাম ও রহিলাম, সেখানেও ঐ পুস্তকখানি আমার নিকট বরাবর ছিল। আমার বেশ মনে আছে ও স্মরণ হয়, আমার যখন বিবাহ হইবে, তখন আপন স্ত্রীকে পুস্তকখানি দিয়া দিব, এই অভিপ্রায়ে উহা কিনিয়াছিলাম ও যত্ন করিয়া রাখিতেছিলাম। এই ভাবটী আমার বড় বিস্ময়জনক মনে হয়। সেজন্যই এই স্মৃতির উল্লেখ

করিলাম। যে অবস্থার মধ্যে আমি লালিত পালিত, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। সমস্ত গ্রামময় কোন উন্নতির চর্চ্চা ছিল না, কোনও স্ত্রীলোক শিক্ষিতা ছিলেন না। বরং ভদ্রলোকেদের মধ্যে পরিবারকে বিশেষরূপে প্রহার করাও দেখিতাম। যখন বইখানি কিনি, তখন আমার বয়স বছর দশেকের বেশী হইবে না। এ অবস্থায় আমার মনে এরূপ দেশ-সংস্কারের ভাব কিরূপে উদয় হইয়াছিল, আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। সে জন্যই আমার বাল্যস্মৃতির মধ্য হইতে এই ঘটনাটীর উল্লেখ করিলাম। নতুবা ইহাতে বর্ণন করিবার কিছুই নাই; বালকের বাল্যমনে এক খেয়াল উঠিয়াছিল; বালক সেই মত কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু প্রশ্ন এই হয় যে, এ ভাবের খেয়াল, এরূপ দেশ-সংস্কার-বিষয়ক চিন্তা মনে কেন উঠে? তখনও দেশীয় গ্রাম্যসমাজে এরূপ চিন্তা উঠিবার কোন ব্যাপারই ছিল না, অথচ এ চিন্তা কেন আসিল?

"ঠিক সকল কথা এখন মনে আসে না, যতদূর মনে হয় যে, দেশে স্ত্রীলোকের শিক্ষা নাই, ইহা মন্দরীতি, এরূপ চিন্তা তখন আমার সে নিতান্ত বালকপ্রাণে উঠে নাই; কেবল এই ভাব ছিল যে, আমার বিবাহের পর আমি আমার স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইব। অন্য স্ত্রীলোকদেরও যে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে, ইহার সঙ্গে সে ভাব জড়িত ছিল কি না, একথা এখন মনে হয় না। যাঁহারা জগতে মহৎ লোক হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের প্রারম্ভ হইতেই দেশ-সংস্কারের ভাবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার যে নিজ স্ত্রীকে শিক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা, তাহা সে প্রকারের আকাঙ্ক্ষা বলে' মনে হয় না; অথচ এ আকাঙ্ক্ষা ছিল, আর ইহাতেই

পরিচালিত হইয়া সেই ছিন্ন পুস্তকখানি কিনিয়াছিলাম ও যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম, বেশ মনে হয়।

"এ সকল চিন্তা করিয়া মনে হয় যে, বিধাতা ছোট বড় সকল লোকের ভিতরেই নিজ নিজ প্রকৃতির অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন; কেবল অঙ্কুর মাত্র দেন, অতি যত্ন করিয়া জীবনে তাহা পরিস্ফুটিত করিতে হয়। এ সকল মানুষকে মঙ্গলের দিকে লইবার জন্য রোপিত হয়; কিন্তু অবস্থাবশতঃ মন্দ জীবন হইলে, সেই অঙ্কুর সেই মন্দ জীবনের মধ্যেও বিশেষত্ব প্রকাশ করে এবং অবসর পাই-লেই মঙ্গলের দিকেই ধাবিত হয়। মহা বলবান্ পুরুষ হয়ত ডাকাতের সর্দ্দার হয়; কিন্তু অবসর পাইলে তাহার সেই বল হয়ত দেশের মঙ্গল-সাধনে নিয়োজিত হয়। এইরূপে মনে হয়, যেন ছোট বড় সকল লোকের ভিতর নিজ নিজ প্রকৃতির এক একটী বিশেষত্ব রোপিত আছে, তাহাই ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়।"

বাল্যজীবনের স্মৃতি হইতে আরও লিখিয়াছেন:—"ইং ১৮৫৪ সালে রেলের গাড়ী প্রথমে ভারতে চলে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথই ভারতে প্রথম প্রস্তুত হয়। হাওড়া হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃই বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। রেলপথ প্রস্তুতির সময় কতই মাটি কাটিয়াছে, কতই মাটি ফেলিয়াছে। কণ্ট্রাক্টারেরা ভিন্ন ভিন্ন যায়গায় খড়ের ঘর করিয়া বাস করিত। আমরা (ছেলেরা) কখন কখন কর্ত্তাদের সঙ্গে তাহাদের সেই অবস্থিতি স্থানে যাইতাম ও ইক্ষুর রস ও মুড়ি খাইতাম। অবশেষে যখন শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত রাস্তা হইয়া গেল, তখন রেলের গাড়ী চলিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে

আমরা (স্কুলের ছেলেরা) কতদিন উত্তরপাড়া স্কুলের ছুটী হইলে, কতক কতক ছেলে একত্র হইয়া পুস্তক হাতে করিয়া, যেখানে বালির খালের উপর পুল হইয়াছে, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইতাম। সেখানে ইঞ্জিনিয়ারেরা খুব বড় বড় মোটা মোটা বাহাদুরী কাঠ পুতিয়া প্রায় দোতলা সমান উচ্চে তাহাদের থাকিবার ঘর করিয়াছিল—নীচে সমস্ত খালি, ঘর উপরে, খুব উচ্চ কাঠের সিঁড়ি দিয়া তাহাতে উঠিতে হইত। আমরা (ছেলেরা) সেই নীচেতে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইতাম। সাহেবেরা যখন উপরে দূরবীণ দিয়া দেখিত, আমরা বুঝিতাম, কোন এঞ্জিন আসিতেছে; তখনি অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতাম। দেখিতে দেখিতে চকিতের মধ্যে সেই এঞ্জিন চলিয়া যাইত। ক্রমে ঘোষণা হইল যে, আগষ্ট মাসে বড় লাট সাহেব (Governor-General) লর্ড ডল্‌হৌসী প্রথমে রেলের গাড়ী শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত চালাইবেন। সেদিন প্রত্যূষ হইলে, রেলপথের ধারে পিপীলিকার সারের মত সব লোক দাঁড়াইয়া রহিল, "ছাবাই আড়ার" কাছেও কত লোক। আমরা সব দেখিতে গেলাম। ক্রমে বেলা ৮৷৯টার সময় রেলের গাড়ী দেখা দিল। এঞ্জিন্‌টার সামনে ফুলের মালা দিয়া সজ্জিত—অল্পই গাড়ী, তিন চারিখানা মাত্র হইবে, তাহার সঙ্গে সংলগ্ন। সকলের চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। সেই প্রথম রেলের গাড়ী ভারতে চলিল, এখন কত হাজার হাজার মাইল রেলের গাড়ী চলিতেছে। এখন আর ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য ভাব নাই—এখন আকাশে বায়ুপথে যে বিমানপোত চলে, তাহাতেই সকলে চমৎকৃত হইতেছে।

"ক্রমে আমরা শুনিতে পাইলাম যে, রেলপথ রাজমহল

পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। পরে ইং ১৮৫৫ সালে, ছেলেরা সব শুনিতে লাগিল যে, সেই সময় সাঁওতালেরা সব ক্ষেপিয়াছে ও অনেক উপদ্রব করিতেছে। আমাদের সকলের কত ভয় হইতে লাগিল। এইরূপে সব গুজব শুনিতে শুনিতে, ইং ১৮৫৭ সালে সিপাই মিউটিনির কথা রাষ্ট্র হইল। আমরা (ছেলেরা) স্কুলের জলপানের ছুটীর সময় গঙ্গার ধারে গিয়া বসিতাম ; আর কত সময় জাহাজে করিয়া কত সৈন্য যাইত, দেখিতে পাইতাম। সকলেরই প্রাণ ভয়ে কম্পিত হইত ও সকলেই ভাবিত যে, সিপাইরা কবে আসিয়া সমস্ত লুটপাট করে, তাহার ঠিকানা নাই। এই ভয়েই সকলে একেবারে ভীত হইয়া থাকিত। আমার বেশ মনে হয়, সেই সময় কি আতঙ্কিতভাবে আমরা জীবন যাপন করিয়া-ছিলাম।”

এদিকে রেভারেণ্ড কে, এম্, ব্যানার্জি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার পরামর্শে, নিবারণচন্দ্রের মাতা তাঁহাদের কলিকাতাস্থ বাড়ীতে বসবাস করা স্থির করিলেন। কৃষ্ণমোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যার মন অতি উদার ছিল এবং তিনি অতি মহামনা দেবী-প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। নিবারণচন্দ্রেরা যে পল্লিগ্রামে থাকেন, ইহা তাঁহার মনঃপূত ছিল না। সে জন্য তিনি ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে নিবারণচন্দ্রদের কলিকাতায় থাকা হয়। তদনুসারে নিবারণচন্দ্রের পিতা, মাতা, ভগ্নি কলিকাতার বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সে সময় নিবারণচন্দ্রের স্কুল পরিবর্ত্তন করিলে পাঠের ক্ষতি হইবে বলিয়া, কিছুদিনের জন্য তাঁহার কোতরং গ্রামেই থাকার বন্দোবস্ত হইল। তিনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় পিতামাতার নিকট

আসিতেন। এই সময়ের একটী ঘটনা তাঁহার বাল্যজীবনের স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"আমি কখন কলিকাতায় যাইতাম ও আবার ফিরিয়া আসিতাম; রেলপথের সুবিধা হওয়ায় আমার পক্ষে এরূপ করা বিশেষ সহজ হইয়াছিল। কিন্তু ইহারও মধ্যে মনের কষ্টের কারণ হইয়াছিল। একবার এইরূপে কলিকাতা হইতে ফিরিতেছি, রেলের ফেরি ষ্টিমারে যাইতেছি, আমার হাতে একটি ছাতা আছে, এমন সময় ষ্টিমারের ভিড়েতে এক সাহেব ও মেমের মাঝখানে আমার হাত পড়ে গেল—সে সাহেব আমার দিকে চাহিলে, আমি যে নিজ হাত ও ছাতা তাহাদের মধ্য হইতে নিষ্কাসিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, সে তাহা বুঝিল না—আমার করুণ দৃষ্টিও সে বুঝিল না—অকারণ তাহার বাম হাতের কনুই দিয়া আমার মুখের উপর আঘাত করিল। আমার হৃদয়ে বড় বেদনা লাগিল। ইহার প্রতিকার আর এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সে মনের ব্যথা মনেই রহিয়া গিয়াছে। এখনও জানিনা যে, ইহাতে তাহাদের দোষ ছিল, কি আমারই দোষ ছিল; কিন্তু আমি নিরীহ ভাল মানুষ ছিলাম, কোন দোষ ত্রুটী করি নাই, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। মনে হয়, ইংরাজ জাতির এই প্রকার অন্যায় ব্যবহার বশতঃই ভারতবাসীরা তাহাদিগকে ভালবাসিতে পারে নাই; এবং এই জন্যই ভারতে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য রহিয়া গিয়াছে।

"ইং ১৮৫৭।৫৮ সালে কোতরঙ্গে যখন আমি স্কুলে পড়িবার জন্য পিতামাতা হইতে পৃথক থাকিতাম, তখন আমার একবার জ্বরবিকার হয়। এ জ্বর বোধ হয়, এখন যাহাকে Typhoid জ্বর বলে,

তাহাই ছিল। তখন গ্রামে ডাক্তার কেহই ছিল না, কেবল মাত্র চিকিৎসক সেই কবিরাজ-পরিবার; আমাকে শ্রীযুক্ত নবকুমার কবিরাজ দেখিতে লাগিলেন। আমার অবস্থা অত্যন্তই সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। আমার মনে আছে যে, আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আমার মাতৃদেবী কাঁদিয়াছিলেন। একমাসের অপেক্ষা অনেক বেশীদিন আমি ভুগিয়াছিলাম, পরে ভগবানের কৃপায় আরোগ্য-লাভ করি, ও আমার পিতামাতা আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে কলিকাতায় আনেন। আমার যতটা মনে হয়, আমি একদিন পুষ্করিণীতে স্নান করিতে করিতে, সেই স্বল্প-জলবিশিষ্ট পুষ্করিণীর জলে অনেকক্ষণ ছিলাম, এবং সেই পুষ্করিণীতে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে বেড়াইয়াছিলাম ও সমস্ত জল একেবারে কর্দ্দমপূর্ণ করিয়া তুলিয়া ছিলাম। ইহাতে আমার বড় আমোদ হইয়াছিল; সাঁতার জানিতাম না, অথচ পুষ্করিণীটা সমস্ত ঘুরিতে ফিরিতে পারিলাম, ইহাই আমার আনন্দের কারণ ছিল। কিন্তু ইহার পরেই, বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। পাড়াগাঁয়ের এমনি অবস্থা ছিল যে, কেহই বালকদের এইরূপ বিষয়ে উপদেশ দিবার লোক ছিল না; এক্ষণে ভগবানের কৃপায় পাড়াগা সকল এ বিষয়ে অনেক ভাল।

"সে সময়ে এই সকল পাড়াগাঁয়ে কোনও ম্যালেরিয়া ছিল না; বরং কোতরঙ্গ প্রভৃতি স্থানকে লোনা যায়গা বলিত। ঐ সকল যায়গায় লোকেরা, বিশেষতঃ ছোট ছেলেরা যাইলে, তাহাদের পেটের অসুখ হইত, এবং তাহাকেই তাহারা লোনা-লাগা বলিত। কোতরঙ্গ প্রভৃতি পাড়াগাঁয়ে বিশেষ কোন উপদ্রব ছিল না, কেবল

ইতর লোকেদের ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে কুৎসিত অভ্যাস প্রচলিত ছিল; তাহা হইতে ছেলেপিলেদের সাবধানে রাখা বড় কঠিন হইত।”

পাঠদ্দশা

ইহার বিবরণ বাল্যস্মৃতিতে এইরূপ আছে:—“ইং ১৮৫৮ সালের প্রায় শেষভাগে আমি কোতরঙ্গ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলাম। সেই সালের ১লা নভেম্বর তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলদারী শেষ হইয়া, ইংরাজের খাস আমলদারী জারি হইয়াছিল। সে দিন কলিকাতার অক্টার্লনি মনুমেণ্টে মহা আতসবাজি হয়। তাহা দেখিবার জন্য লোকে লোকারণ্য; আমিও দেখিতে গিয়াছিলাম। কি হইল, কিছুই বুঝিতে পারি নাই; তবে খুব বাজি ছোড়া হইয়াছিল, এই জানি। রাত্রি দশটার সময় আমরা বাড়ি ফিরে আসি।”

ইং ১৮৫৯ সালের আরম্ভেই, নিবারণচন্দ্র কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের (পরে যাহার নাম হেয়ার স্কুল হয়) দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখন সে স্কুলে প্রধান শিক্ষক সুবিখ্যাত প্যারীচরণ সরকার মহাশয়, দ্বিতীয় শিক্ষক নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও এসিষ্টাণ্ট শিক্ষক গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয় ছিলেন। এই গিরিশচন্দ্র সুবিখ্যাত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শিবচন্দ্র দেবের আত্মীয় ছিলেন। নীলমণি বাবু বড়ই ভাল লোক ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিত। তৃতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার ফলে উন্নীত বালক ছাড়া, চতুর্থ

শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুইটী বালক নিজ দক্ষতার পুরস্কার-স্বরূপে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া আসে। এই বালক দুইটীর নাম গোবিন্দ-চন্দ্র ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ। গোবিন্দ ও দেবেন্দ্র চতুর্থ শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসায়, তাঁহাদের বসিবার স্থান সকলের পশ্চাতে হয়। নিবারণচন্দ্রও মফঃস্বলের স্কুল হইতে আসায়, তাঁহারও স্থান উঁহাদের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট হয়। একত্রে বসা হেতু এই তিন জনের মধ্যে খুব সৌহৃদ্য হয়। বিশেষতঃ গোবিন্দের সঙ্গে নিবারণের সুদৃঢ় বন্ধুতা জন্মে। গোবিন্দ অতি বুদ্ধিমান্ ও ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণী হইতে যে সকল বালকেরা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বড়ই দুর্দ্দান্ত ছিল; নিবারণ ও গোবিন্দ তাহাদের ভয় করিতেন। নিবারণ ও গোবিন্দের মধ্যে হৃদ্যতার জন্য, এবং দুইজনে একত্রে স্কুলের সকল শ্রেণীতে ও কলেজে পাঠ করায় ও পরীক্ষা দেওয়ায়, তাঁহাদের রুচি ও মনের ভাব অনেকাংশে একই প্রকার দাঁড়াইয়াছিল। উভয়ে সকল কাজ এক জোটে ও এক পরামর্শে করিতেন। নিবারণের মাতার মনে আশঙ্কা ছিল যে, পল্লীগ্রাম হইতে আগত তাঁহার পুত্রের প্রতি কলিকাতার বালকেরা দুর্ব্যবহার করিবে, সেজন্য পাড়ার একটী বালককে নিবারণকে দেখাশুনা করিবার ভার দেন। সে বালকটি নিবারণকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইত। ঐ বালকটি অন্য কয়েকটি বালকের সহিত সন্ধ্যাকালে একস্থানে একত্র হইয়া গান ও বাজনা শিখিত। একদিন ঐ বালকটি নিবারণকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে লইয়া যায়। তাহাদের গান বাজনা যদিও নির্দ্দোষ ছিল, তত্রাচ নিবারণের তাহা মোটেই ভাল লাগে নাই। সেজন্য আর কোন দিন সেখানে যান নাই।

কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে পঠদ্দশায়, ইং ১৮৫৯ সালে নিবারণচন্দ্র শুনিতে পাইলেন যে, কেশবচন্দ্র সেন বলিয়া একজন মনোবিজ্ঞান (Mental Philosophy) সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন। নিবারণ-চন্দ্রের ও গোবিন্দের মনোবিজ্ঞান শিখিবার জন্য খুব আগ্রহ ছিল। ইং ১৮৬০ সালে দুইজনেই ঐ মনোবিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য, ঐ বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। শিক্ষক নীলমণি বাবু প্রকারান্তরে এ বিষয়ে উঁহাদের উৎসাহ দিতেন। প্যারীবাবু কিন্তু নিরুৎসাহই দিতেন। গিরিশ বাবু এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন।

এখানে একটী বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিবারণচন্দ্র দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া মানুষ হন। স্কুলে পঠদ্দশায় তাঁহার বস্ত্রাদির সংখ্যা অতি অল্প ছিল। অথচ স্কুলে পরিষ্কার বস্ত্র পরিয়া যাইতে হইত। সেজন্য তাঁহাকে প্রতিদিন সাবান দিয়া, নিজেই স্কুলের বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া লইতে হইত। সাবান কিনিবার জন্য অন্য লোক সাহায্য করিতেন। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে, কতিপয় সম্রান্ত হিন্দু অধিবাসীরা 'মেট্রোপলিটান কলেজ' নাম দিয়া একটি বিদ্যালয় খুলেন। অধ্যাপক ডি, এল্, রিচার্ডসন প্রভৃতি সেখানে অধ্যাপনা করিতেন। কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটিতে সুবর্ণবণিক-জাতীয় মল্লিক মহাশয়দের বাটীতে ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া কিছুদিন ছিল। যখন প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন এ দেশকে আলোড়িত করিতেছিল, সেই সময় মল্লিক মহাশয়দের উক্ত বাটীতে "বিধবা-বিবাহ-নাটক' শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে অভিনীত হয়। এই বাটীতেই কেশব-চন্দ্রের মনোবিজ্ঞান-বিদ্যালয় প্রথমে আরম্ভ হয়। পরে যোড়াসাঁকো

ব্রাহ্ম (আদি) সমাজ গৃহের দ্বিতলে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে থাকে। তখনই নিবারণচন্দ্র তাহাতে ইং ১৮৬০ সালে যোগ দেন। তখন প্রতি রবিবারে প্রাতঃকালে, কেশবচন্দ্র ইংরাজিতে ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালাতে উপদেশ দিতেন। মহর্ষির সেই উপদেশগুলি পরে "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্রের উপদেশগুলিও ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে (Pamphlet) প্রকাশিত হইত। উপদেশকালে ৭০।৮০ জন বা ততোধিক শ্রোতা উপস্থিত হইতেন। তখনকার স্কুল কলেজের ভাল ভাল ছাত্রেরা ইহাতে উপস্থিত হইতেন ও ক্রমে ঐ মতাবলম্বী হয়েন। সে সময়কার ব্রাহ্মসমাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল।

ইং ১৮৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে, নিবারণচন্দ্র, দেবেন্দ্র ও গোবিন্দ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পান। ইহাতে নিবারণচন্দ্রের প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবার সুবিধা হইল এবং বাটীতে সাংসারিক খরচেরও অনেকটা সাহায্য হইতে লাগিল।

সে সময়ে প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষা দিবার জন্য ৫৲ টাকা মাত্র ফি (Fee) লাগিত। নিবারণচন্দ্রের তাহাও দিবার সামর্থ্য ছিল না। Rev. K. M. Banerjee মহাশয় সে পাঁচ টাকা দিয়া সাহায্য করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়া নিবারণচন্দ্র ক্রমান্বয়ে ফার্ষ্ট আর্টস্ (First Arts), বি,এ (B.A.) ও দর্শন-শাস্ত্রে এম্,এ (M.A.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বরাবরই বৃত্তি (Scholarship) পাইয়াছিলেন বলিয়া, ঐ কলেজে B.L. ক্লাসেও পড়িতে পাইবার সুবিধা হইয়াছিল। ইংরাজি ১৮৬১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া, ১৮৬২ সালের শেষভাগে First Arts এবং ১৮৬৫ সালের

প্রথমভাগে Bachelor of Arts এবং ১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Master of Arts পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। M. A. পরীক্ষার ফলের ভিতর Calcutta University Calendarএ নিবারণচন্দ্রের ফল সম্বন্ধে একটু ভুল লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিবারণচন্দ্রের জামাতা জ্ঞানেন্দ্রের সৌহার্দ্দ্য ছিল। উঁহারা এক সময়েই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেন। সার্ আশুতোষ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার ছিলেন, তখন জ্ঞানেন্দ্রকে বলেন যে, তাঁহার শ্বশুর মহাশয় M. A. পরীক্ষায় Mental Philosophyতে প্রথম শ্রেণীর (First Class) মার্ক পাইয়াছিলেন। সার্ আশুতোষ Universityর কাগজপত্র দেখিয়া তাহা অবগত হইয়াছেন। কিন্তু ভুলক্রমে University Calendarএ তাঁহার নাম দ্বিতীয় শ্রেণীতে দেখান হইয়াছে ও তাহাই চলিয়া আসিতেছে। সার্ আশুতোষ জ্ঞানেন্দ্রকে বলেন যে, নিবারণচন্দ্রের দ্বারা তাঁহার (আশুতোষের) নামে এই ভুল সংশোধনের জন্য একখানি আবেদন যেন পাঠান। জ্ঞানেন্দ্র নিবারণচন্দ্রকে তাহা বলিলে, তিনি হাসিয়া বলেন যে, ও ভুল সংশোধন করিয়া কি আর লাভ হইবে। তিনি আর আবেদন করিলেন না।

একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা হইতে দেখা যায় যে, অল্পবয়সেই নিবারণচন্দ্রের কিরূপ সত্যের প্রতি আস্থা ছিল। তখনকার দিনে ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে কেহ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিত না। নিবারণচন্দ্র যখন ঐ পরীক্ষা দেন, তখন

প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বয়স ষোল বৎসরের ন্যূন ছিল। নিবারণচন্দ্রের তাহা জানা ছিল না। অভিভাবকেরা তাঁহাকে ষোল বৎসর লিখাইতে বলেন, তিনিও তাহা ঠিক মনে করিয়া লিখেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিও পান। First Arts পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিবার সময় নিবারণচন্দ্র তাঁহার প্রকৃত বয়স জানিতে পারেন ও সেইরূপ আবেদনপত্রে (application) লিখেন। মিঃ সট্‌ক্লিফ্ সাহেব তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ছিলেন। বয়সের গোলযোগ যেমন নিবারণচন্দ্রের হইয়াছিল, তেমনই তাঁহার সহপাঠী স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের (বর্ত্তমান হাইকোর্টের জজ সার্ চারুচন্দ্র ঘোষের পিতা) হইয়াছিল। উভয়ের পরীক্ষা দিবার আবেদন যেদিন সট্‌ক্লিফ্ সাহেবের নিকট বিবেচনার জন্য উপস্থিত হয়, তিনি দেবেন্দ্র ও নিবারণচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠান। নিবারণচন্দ্র তাঁহার নিকট যাইলে ক্রুদ্ধভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় বয়স বাড়াইয়া কেন পরীক্ষা দেওয়া ও বৃত্তি লওয়া হইয়াছিল? নিবারণচন্দ্র উত্তর দিলেন যে, তাঁহার অভিভাবকেরা প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় তাঁহাকে যে বয়স তাঁহার বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই বয়স লিখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন তিনি তাঁহার প্রকৃত বয়স জানিতে পারিয়াছেন, সেজন্য এখন তাহাই লিখিয়াছেন, মিথ্যা লিখিতে পারেন নাই। সট্‌ক্লিফ্ সাহেব ক্রুদ্ধভাবে আদেশ করিলেন, "যাও, গিয়া বইস"। দেবেন্দ্র তখন অনুপস্থিত ছিলেন। আসিলে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

নিবারণ ও দেবেন্দ্র উভয়েই বৃত্তিধারী ও কলেজের ভাল ছাত্র ছিলেন। পরে দেবেন্দ্র আসিয়া সট্‌ক্লিফ্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলে, তাঁহাকে উক্ত সাহেব ক্রুদ্ধভাবে তিরস্কার করেন ও তাঁহার তিন মাসের বৃত্তি যাহা তখন প্রাপ্য, তাহা স্থগিত ও বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে নিবারণচন্দ্রের মনে বড়ই ত্রাস উপস্থিত হয় যে, হয়ত তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না ও তাঁহারও তিন মাসের বৃত্তি হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন। নিবারণচন্দ্র কলেজ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে যান। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে অত্যন্ত বিপন্ন দেখিয়া সান্ত্বনা দেন ও বলেন যে, বয়স সম্বন্ধে যে নিয়ম, তাহা ইউনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা গঠিত, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রমও করিতে পারেন। নিবারণচন্দ্র অল্প বয়সের বালক, এ কথার তাৎপর্য্য তখন বুঝিতে পারেন নাই। প্রকৃত পক্ষে নিবারণচন্দ্র ও দেবেন্দ্র উভয়কেই পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হয়। অধিকন্তু নিবারণচন্দ্র তিন মাসের বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হন নাই। বোধ হয়, সহৃদয় মিষ্টার সট্‌ক্লিফ মহোদয় নিবারণচন্দ্রের দরিদ্রাবস্থাহেতু তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করেন নাই; কিন্তু দেবেন্দ্র যদিও পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইলেন, তাঁহার তিন মাসের বৃত্তি পাইলেন না। ইহাতে নিবারণচন্দ্রের মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল।

মিঃ সট্‌ক্লিফ্ নানা বিষয়ে তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার সুখ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। নিবারণচন্দ্রকে রেভারেণ্ড কে, এম্, ব্যানার্জ্জি মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, মিষ্টার সট্‌ক্লিফের মত সুজন দুষ্প্রাপ্য ছিল।

কর্ম্মারম্ভ ও বিবাহ

ইং ১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সেই সালের জুলাই মাসেই একুশ বৎসর বয়সে, নিবারণচন্দ্র মজঃফরপুর গবর্ণমেণ্ট জিলা-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের (Head Master) পদে নিযুক্ত হইয়া সেখানে যাইবার জন্য রওয়ানা হন। তখন উত্তর বিহারে রেলপথ (Railway) ছিল না। বাঁকিপুর পর্য্যন্ত রেলে গিয়া, বহু কষ্টে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া, হাজিপুরে উপস্থিত হন। সেখান হইতে পাল্‌কীযোগে মজঃফরপুর পঁহুছেন। এক বৎসর কাল সেখানে কার্য্য করিয়া ছুটী (leave) লইয়া ইং ১৮৬৭ সালে কলিকাতায় আইসেন। তাহার পর বরিশাল জেলার লাখুটীয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ উকীল ও জমীদার ৺রাজচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব আইসে। কন্যার ভ্রাতা বিহারীলাল রায় মহাশয়ের উদ্‌যোগেই এই বিবাহ সংঘটিত হয়। তখন বরিশাল গমনাগমন দুরূহ ব্যাপার ছিল। Steamer তখন যাতায়াত করিত না। "বিহারী বাবু কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুবর্গ এবং বরকে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আইসেন। তিনখানি বৃহৎ নৌকাতে কেশবচন্দ্র, তাঁহার বন্ধুবর্গ এবং পাত্র কলিকাতা হইতে বরিশাল যাত্রা করেন। কেশবচন্দ্র, ভাই প্রতাপচন্দ্র এবং ভাই মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সপরিবারে নৌকারূঢ় হইয়াছিলেন। একজন সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে যখন বিবাহোৎসব, তখন বিবিধ প্রকারের বাহ্য আয়োজন প্রচুর পরিমাণে হইবে, ইহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এ সকল ব্যাপার অপেক্ষা,

পূর্ব্বাঞ্চলে একটী ধনীর গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্যক্ অধিকার স্থাপন, একটী মহানন্দের ব্যাপার ছিল। সে দেশীয় লোকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কতকগুলি অযুক্ত সংস্কার ছিল, তাহা অপনয়ন করিবার পক্ষে এ বিবাহ অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার অধিবাসিগণের মধ্যে কেমন একটা গূঢ় অসদ্ভাব অনেকদিন হইতে ছিল, এক অপরের আচার ব্যবহার ও ভাষার দোষানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইত; এই বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে সে ভাবের স্রোত অবরুদ্ধ হইবার সূত্রপাত হইল।"

তাহা ছাড়া একজন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব যুবকের সহিত একটী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভবা কন্যার বিবাহে কেশবচন্দ্র জাতিতে বৈদ্য হইয়াও আচার্য্য ও পৌরোহিত্যের কাজ করিলেন, ইহা সে সময়ের পক্ষে একটি ভয়ঙ্কর কাণ্ড। ইহার পূর্ব্বে উক্ত দুই বংশের কোন ক্রিয়াকলাপ অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয় নাই। ফলতঃ এই বিবাহটী একটি বিশেষ ঘটনা, কেননা এই বিবাহোপলক্ষে নূতন প্রণালীর বিবাহপদ্ধতির প্রথম অভ্যুদয়। এখনও প্রায় সেই পদ্ধতিই রহিয়া গিয়াছে। এই বিবাহ ১৭৮৯ শকের ১৩ই শ্রাবণ (ইং ১৮৬৭।২৮শে জুলাই) রবিবার সম্পন্ন হয়। তখন বরের বয়স ২২ বৎসর ও কন্যার বয়স ১৩ বৎসর ছিল। নিবারণচন্দ্রের পিতামাতা এ বিবাহ প্রত্যক্ষ ভাবে অনুমোদন করেন নাই, কিন্তু নিবারণচন্দ্রের সহপাঠী স্বর্গীয় মুন্সেফ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ দ্বারায় জানাইয়াছিলেন, যে, বরকন্যা যেন তাঁহাদের কলিকাতাস্থ বসতবাটীতে আসিয়া উঠেন।

বরযাত্রীরা বরিশালে পঁহুছিবার পর, বর লাখুটীয়ায় গিয়া কন্যাকে

দেখিয়া বিবাহে সম্মতি প্রদান করেন। বিবাহে বরিশালস্থ অনেক রাজকর্ম্মচারী যোগদান করেন, এমন কি আফিসেও ছুটী দেওয়া হয়। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, কান্তি-চন্দ্র মিত্র, গৌরগোবিন্দ রায় ও উমানাথ গুপ্তও কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। বিবাহান্তে বরকন্যা কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই বিবাহের বিবরণ ইং ১৮৬৭ সালের ১৫ই আগষ্টের "Indian Mirror" পত্রিকায় বর্ণিত হইয়াছিল। বরিশালে তখন স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, অঘোরনাথ গুপ্ত ও গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ছিলেন। স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস ও যদুনাথ বাবুর উদ্যোগে সেখানে একটী মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়; সেখানে প্রচারকদের স্ত্রীদের, লাখুটীয়ার জমীদার পরিবারের ও অন্যান্য মেয়েদের বাঙ্গলা পড়ান হইত। যদুবাবুই এই বিবাহের প্রস্তাব করেন।

বরিশাল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিবারণচন্দ্র পিতামাতা, ভগ্নি, ভগ্নিপতি ও স্ত্রীর সহিত কর্ম্মস্থান মজঃফরপুরে রওয়ানা হইলেন। ট্রেণ ফেল করিয়া, সমস্ত রাত্রি হাওড়া ষ্টেশনে যাপন করিয়া, পরদিবস প্রাতঃকালের ট্রেণ ধরিয়া বাঁকিপুরে যাইলেন। বাঁকিপুরে তখন (এলাহাবাদ-প্রবাসী) অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। গঙ্গানদী সেই বর্ষাকালে পার হওয়া দুরূহ ব্যাপার। সেইজন্য সমুদয় পরিবারকে ১৫ দিনের জন্য অবিনাশবাবুর গৃহে রাখিয়া, নিবারণচন্দ্র একা মজঃফরপুর রওয়ানা হইলেন। সেখানে ফিরিবার অল্পদিন পরেই হঠাৎ বহরমপুর বদলী হন। হাতে টাকাকড়ি নাই, কোন প্রকারে

গোযানে হাজিপুরে আইসেন। হাজিপুরের সবডিভিসনাল অফিসার তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন। ইং ১৮৬৭ সালের নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বর মাসে বহরমপুর স্কুলের কার্য্যে যোগ দেন। সেইখান হইতে B. L. পরীক্ষা দেন। সেবার সফলকাম হন না। পর বৎসর L. L. পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হয়েন এবং তখনকার নিয়মানুযায়ী গ্রাজুয়েট থাকা বশতঃ Extra fee দিয়া B. L. উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। সেই সময় (১৮৬৮ খৃঃ অঃ) ভাগলপুরে ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয় এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন। তিনি ভাগলপুর স্কুলের হেড মাষ্টারের সঙ্গে, নিবারণবাবুর স্থান পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন। তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়ায়, মার্চ্চ মাসে নিবারণচন্দ্র ভাগলপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হন। ইং ১৮৬৮ সালের মার্চ্চ হইতে ১৮৭৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সেই পদে থাকিয়া কার্য্য করেন। ইহার পূর্ব্বে একবার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ভাগলপুরে আইসেন। নিবারণচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন যে, স্কুলে অল্পবয়সে হেডমাষ্টারি করাতে, তাঁহার মেজাজ বড়ই উদ্ধত হইয়া উঠে; তাহা সংশোধন করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে আর্থিক উন্নতির জন্যও, ছয় মাস অবসর লইয়া ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৭১ খৃঃ অঃ ১৫ই জানুয়ারী তারিখে নিবারণচন্দ্রের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনীর ও ১৮৭২ খৃঃ অঃ ২৪শে আগষ্ট তারিখে প্রথম পুত্র সতীশচন্দ্রের জন্ম হয়।

ওকালতি আরম্ভের পূর্ব্বেই রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ, বাবু অতুলচন্দ্র মল্লিক (O. C. Mullick), রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু গোপালচন্দ্র সরকার ও ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ইঁহাদের সহিত

তাঁহার বন্ধুতা জন্মে। অতুলবাবুর বাড়ীতে প্রায়ই বন্ধুদিগের সম্মেলন ও আহারাদি হইত। ঐ সময় উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সুরা-পানাদিও করিতেন। নিবারণ বাবু পানাদিতে যোগ দিতেন না। নির্দ্দোষ আহারাদি মাত্র গ্রহণ করিতেন। একদিন একজন মোক্তার এই বলিয়া তাঁহার নিকট মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, "আপলোক্ তো একসাথ খাতে হ্যায়, মেল হ্যায়, পিতে হ্যায় (drink wine)"; ঐ মন্তব্য শুনিয়া নিবারণচন্দ্রের মনে ঐ সঙ্গ ছাড়িবার জন্য প্রতিজ্ঞা হইল এবং ঐ দলে যাতায়াতও ক্রমে ক্রমে কম করিতে লাগিলেন। একদিন অতুলবাবু ও তাঁহার স্ত্রী নিবারণচন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া, কেন ঐ দল ছাড়িতেছেন, সেই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহেন।

ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ।

এস্থলে ভাগলপুরের ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর কথা কিছু বলা প্রয়োজন। নিবারণচন্দ্র ইং ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসের ৯ই তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহার প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সভ্য স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ দেব মহাশয় তাঁহার "অতীতের ব্রাহ্মসমাজ" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত করিবার জন্য, ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ও অন্যান্যের Photo চাহিয়া পাঠান। ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিবারণচন্দ্র উক্ত ত্রৈলোক্য দেব মহাশয়কে প্রত্যুত্তরে যাহা লিখেন, তাহার

অনুলিপি ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রোসিডিং পুস্তক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ। ইং ১৮৬৪, ২২শে ফেব্রুয়ারী, বাং ১২৭০, ১১ই ফাল্গুন, সমাজের প্রথম আরম্ভ হয়। ৺ব্রজকিশোর, ৺নবকুমার ও ৺মধুসূদন সরকার প্রথমে আরম্ভ করেন। ৺ডাক্তার K. D. Ghosh, Asst. Surgeon ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺বামাচরণ ঘোষ পরে আসিয়া যোগ দেন। পরে ইং ১৮৬৮ সাল হইতে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যোগ দেন। পরে ৺ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যোগ দেন।

"ইং ১৮৭৯।৮০ সালে স্বর্গীয় প্রচারক ভাই দীননাথ মজুমদার যোগ দেন। ইং ১৮৮০ সালে সমাজের গৃহ ৺রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়া, ইং ১৮৮১ সালের ১১ই ফাল্গুন, উৎসব উপলক্ষে স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করেন। ইং ১৮৮৬ সালে স্বর্গগত সাধক হরিসুন্দর বসু যোগ দেন। প্রথম হইতেই সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে এবং কলিকাতা হইতে প্রচারক কোন বৎসর কেহ, কোন বৎসর কেহ আসিয়া থাকেন। এ সমাজ নববিধান-সমাজভুক্ত বলিয়া গণিত, কিন্তু সকল সমাজেরই প্রচারক কার্য্য করিবার অবসর পান। মন্দিরের ছবি পাঠান হইল।"

(স্বাক্ষর) নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

ভাগলপুর মন্দিরের উপর Cross, Crescent ইত্যাদি সমন্বয়-সূচক ইষ্টক নির্ম্মিত emblem প্রবেশ-পথের উপরে আছে।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার, ভগবতী বসু ও ব্রজকিশোর বসু ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য না হইলেও, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সহিত তাঁহাদের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ (সুবিখ্যাত শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্র ঘোষের পিতা) ইং ১৮৭২ সালে বিলাত যাত্রা করেন। ঐ সময় ভাগলপুরের ব্রাহ্মেরা "ভাগলপুর ইউনিয়ন" প্রবর্ত্তন করেন এবং প্রতি সপ্তাহে এক এক জনের বাড়ীতে পালা ক্রমে প্রতি রবিবার উপাসনা আরম্ভ হয়। এই সময়ে একটী ব্রাহ্মপল্লী সংগঠনের কল্পনা হয়। "জলাকুঠী" মিঃ আণ্টনীর সম্পত্তি ছিল এবং উহা তখন খালি পড়িয়া ছিল। ইং ১৮৭৮ সালে উহা খরিদ করিয়া, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব হয়। নিবারণচন্দ্রের হস্তে টাকা কড়ি কিছুই ছিল না। যাহা হউক, কোন রকমে জমি ক্রয় করা হইল। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া একটী কিংবা দুইটী টাকা হস্তে করিয়া গৃহ-নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। যখন হাতে কিছু অর্থ আসিত. তখনই নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিত; যখন হাতে টাকা না থাকিত, তখন কার্য্য বন্ধ থাকিত। এই প্রকারে ইং ১৮৮১ সালে গৃহ-নির্ম্মাণ একপ্রকার শেষ হইল। ইং ১৮৮১ সালে, ১৮ই জুলাই, নিবারণচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র জ্যোতিষচন্দ্রের জন্ম হয়।

বাবু বামাচরণ ঘোষ কমিশনর আফিষে কার্য্য করিতেন। কমিশনরের পার্সন্যাল এসিষ্টাণ্ট তাঁহাকে পাটনায় বদলী করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ভাগলপুরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাইতে

তিনি চাহিলেন না। নিবারণ বাবু যখন ভাগলপুর আসেন, তখন সাপ্তাহিক উপাসনা ব্রজকিশোর বাবুর বাড়ীতে হইত। তাহার পরে কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে হইতে থাকে। কৃষ্ণধন বাবুর বিলাত গমনের পর ও মন্দির-নির্ম্মাণ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিবারণ বাবুর বাড়ীতে হইতে থাকে।

মন্দির-নির্ম্মাণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাৎসরিক উৎসব, এক এক জনের বাড়ীতে এক এক বৎসর হইত। নবকুমার বাবু পূর্ব্বে যে দিনে ভাগলপুরে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করেন, সেই তারিখ লইয়া উৎসবের সূত্রপাত। ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার স্থানের অত্যন্ত অভাব বোধ করিলেন, এবং সেইজন্য একখণ্ড জমির সন্ধানে রহিলেন। পরে ক্লিভল্যাণ্ড রোড ও ওয়েস্ রোডের সঙ্গমস্থানে জমিদার হরিমোহন ঠাকুরের নিকট হইতে একখণ্ড জমিও লইলেন।

নিবারণ বাবু এই জমির উল্লেখ (রাজা) শিবচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের নিকট করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য যত্ন লইতেন। বাবু সারদাচরণ চট্টোপাধ্যায় (ডিঃ মাঃ) তখন ভাগলপুরে ছিলেন। নকুড়বাবু যে জমি লইয়াছিলেন, সেই জমি তিনি নিজে লইতে উৎসুক হইলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের জন্য যাহাতে ঐ জমি ব্যবহার না হয়, তাহার চেষ্টা করিলেন। নিবারণ বাবু সারদা বাবুর সমক্ষে, শিবচন্দ্রের নিকট সারদা বাবুর প্রতিকূলতার উল্লেখ করেন। শিবচন্দ্র নকুড় বাবুর লওয়া জমি ছাড়িয়া দিতে বলেন। পরে নিকটেই একখণ্ড জমি শিবচন্দ্র মোকররি মৌরসী সত্ত্বে গ্রহণ করিয়া, নিবারণ বাবুকে বলেন যে, সেই জমি হইতে যতটা জমি

ব্রহ্মমন্দিরের জন্য তিনি লইতে চান, ততটা লইতে পারেন। নিবারণচন্দ্র কিন্তু ১৩ কাঠার বেশী জমি লইলেন না। শিবচন্দ্র একটী পাকা মন্দির প্রস্তুত করিতে কত ব্যয় হইবে জানিতে চাহিলেন এবং বলিলেন যে, কোন একব্যক্তি সেই ব্যয়ভার লইতে রাজী আছেন। মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল, এবং যেমন যেমন অর্থের আবশ্যক হইল, শিবচন্দ্র তাহা দিতে লাগিলেন। তখনও জানা যায় নাই, এ অর্থ কে ব্যয় করিতেছেন। পরে রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ উকীল বলেন যে, স্বয়ং শিবচন্দ্র সমস্ত অর্থ দিয়াছেন। ইং ১৮৮১ সালের প্রারম্ভেই মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। ইহার ট্রষ্টডীড পরে সম্পাদিত হইয়াছে। সে সময় ভাই দীননাথ মজুমদার ভাগলপুরে থাকিতেন। তিনি মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য কেশবচন্দ্রকে আহ্বান করেন। নববিধান তখন ঘোষিত হইয়াছে। নিবারণচন্দ্র তখনও নববিধান সমগ্র হৃদয় দিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি neutral রহিলেন। শিমলা হইতে কেশবচন্দ্র নববিধান-স্বীকার-পত্রিকা স্বাক্ষরের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ঐ পত্রিকা (notification) পাইয়া স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের একটি মিটিং হয়। বামাচরণ বাবু ও নিবারণ বাবু ছাড়া সকলেই ঐ পত্রিকায় স্বাক্ষর করেন। কেশবচন্দ্র মন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্য আসিতে দ্বিধা করেন। ভাই দীননাথ তখন কেশব-চন্দ্রকে লিখেন যে, নিবারণবাবু প্রকৃতপক্ষে নববিধান-বিশ্বাসী। তাহার পর কেশবচন্দ্র ইং ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভাগলপুরে আসিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় রামেশ্বর দাস তখন ভাগলপুরেই ছিলেন।

এই সময়ে বাবু হরগোপাল সরকার "তেজনারায়ণ স্কুলের" হেডমাষ্টার ছিলেন। বঙ্গের লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর মহোদয় দেশীয় লোক দ্বারা শিক্ষা-বিস্তারের প্রস্তাব করেন। বাবু লাডলী মোহন ঘোষ মহাশয় তেজনারায়ণ সিংহ মহাশয়কে সেই কার্য্যের ভার লইতে প্রবৃত্ত করান। তদনুসারে একটী Education Committee গঠিত হয়। নিবারণ বাবু ইহাতে অনেক পরামর্শ ও উৎসাহ দেন।

ইং ১৮৭৪ সালে নিবারণচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যার জন্ম হয়, ১৮৭৯ সালে তৃতীয়া কন্যার জন্ম হয়, ১৮৮১ সালে জুলাই মাসে দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয় এবং ১৮৮৪ সালে চতুর্থ কন্যার জন্ম হয়। ইং ১৮৮০ সালে ভাই দীননাথ ভাগলপুরে "ব্যাণ্ড অফ্ হোপ্" স্থাপনে ও পারিবারিক উপাসনা-কার্য্যে অনেক সাহায্য করেন। পাড়ায় ক্রমে বামাচরণ বাবু ও রামলাল বাবুর গৃহ নির্ম্মিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বাবু ও হরিনাথ বাবু "জলাকুঠীর" পুরাতন বাঙ্গালা ভাগ করিয়া দুই অংশে বাস করিতে থাকেন। ভাই দীননাথ এই সকল পরিবারে প্রত্যহ উপাসনার ও ঐ ঐ পরিবারস্থ বালিকাদিগের শিক্ষার ভার লয়েন। তাহা অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইত। এই সময়ে সেবাব্রত লওয়ারও ব্যবস্থা হয়। কোন স্থানে কেহ রুগ্ন হইলে, পাড়া হইতে লোক গিয়া তাঁহাদের সেবা করিত।

নিবারণ বাবু ভাগলপুরে আসিয়াই, সবজজ বাবু নরোত্তম মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে বালিকা-বিদ্যালয়ের মিটিংএ যোগ দেন। স্বর্গীয় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ, অতুলচন্দ্র মল্লিক, কৃষ্ণধন ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সভ্য ও নিবারণ বাবু সম্পাদক হন। বালিকা-বিদ্যালয় প্রথমে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে, পরে

নিবারণচন্দ্রের বাটীতে হইত। পরে (রাজা) শিবচন্দ্র বিদ্যালয়ের জন্য একটী ছোট গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেন। এখন এই গৃহ প্রশস্ত হইয়াছে, অনেক বালিকা সেখানে বিদ্যালাভ করিতেছে। নিবারণচন্দ্র বহুকাল ইহার সম্পাদক ছিলেন। এই বিদ্যালয়টি প্রথম ইং ১৮৬৭ সালে স্থাপিত হয়। প্রথম অবস্থায় গরুর গাড়ী করিয়া মেয়েদের স্কুলে আনা হইত। ভাগলপুর Union ৩।৪ বৎসর থাকিয়া উঠিয়া যায়।

নিবারণ বাবু ১৮৭৪ খৃঃ অঃ ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করিবার অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার আইনজ্ঞানের দক্ষতার জন্য পসার জমিয়া উঠে এবং মাসিক আয়ও বাড়িয়া যায় এবং প্রধান উকিল বলিয়া গণ্য হন। কিন্তু তিনি অন্যায় ও অসত্য মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন না। বাছিয়া বাছিয়া মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন। তাঁহার উপাসনাদিতে অনেক সময় যাইত এবং তজ্জন্য আদালতে যাইতে দেরী হইত। ধার্ম্মিক ও সত্যনিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং সেজন্য সকলেই ও সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা উঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। এমন কি, আদালতের বিচারকেরাও তাহা জানিয়া, যে সকল মোকদ্দমায় উনি নিযুক্ত থাকিতেন, সেই সকল মোকদ্দমা যত দেরীতে পারিতেন আরম্ভ করিতেন। ক্রমে যে সকল মোকদ্দমা উনি লইতেন না, সেই সকল মোকদ্দমা অন্য উকীলেরা লইয়া কৌশলে জিতিতে লাগিলেন, ও ক্রমে নিবারণ বাবুর পসার কমিয়া আসিতে লাগিল। ইং ১৮৮৫ খৃঃ অঃ উঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। পরে ইং ১৮৮৬ সালে (খৃঃ অঃ) রাজবনেলীর জমিদারী আপিসে স্বল্প বেতনে Law Agentর চাকুরী লইতে বাধ্য হন এবং

কোনও প্রকারে সংসারের ব্যয় কুলাইতে থাকেন। এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই বলিতেন যে, একজন লোককে (নিবারণ বাবুকে) মাত্র তিনি দেখিয়াছেন, যিনি টাকা আসিতেছে, তাহা পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, ধর্ম্মের পথে এবং সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতার পথ অবলম্বন করিয়া, দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছেন। যাঁহারা নিবারণচন্দ্রের সম্পর্কে আসিয়াছেন, সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

পারিবারিক ঘটনা

নিবারণচন্দ্রের প্রথম সন্তান, প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনী ভাগলপুর বালিকা-বিদ্যালয় হইতে দশ বৎসর বয়সে, মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, Scholarship লইয়া, কলিকাতা বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে যান। সেখানে দুই বৎসর শিক্ষালাভ করিয়া, অর্থাভাবে শিক্ষা বন্ধ করিয়া ভাগলপুরে ফিরিয়া আইসেন। ইং ১৮৮৬ সালে তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর হয়। নিবারণ বাবু তাঁহার বিবাহের জন্য পাত্র অনুসন্ধানের ভার, তাঁহার বিশেষ বন্ধু, কলিকাতা City Collegeএর Principal ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর দেন। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলিকাতার Presidency Collegeএ M A. Classএ পাঠ করিতেছিলেন। উমেশ বাবু তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতেন এবং জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রেরও উমেশচন্দ্রের উপর ভক্তি ও প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। জ্ঞানেন্দ্র উমেশ বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। উমেশ বাবু নিবারণবাবুকে লিখিলে,

তিনি সম্মত হইয়া কন্যা ও পরিবারসহ তাঁহাদের কলিকাতার বাটীতে আসিলেন। উমেশ বাবু বিবাহের রেজিষ্ট্রার ছিলেন। নিবারণ বাবু কলিকাতায় আসিলে, জ্ঞানেন্দ্রকে তাঁহার বাটীতে আহ্বান করিলেন ও কন্যার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন; এবং ২।১ দিনের মধ্যেই বিবাহের নোটিশ বিবাহ-রেজিষ্ট্রার উমেশ বাবুর নিকট দেওয়া হইল। জ্ঞানেন্দ্রের পিতামাতা হিন্দুসমাজ-ভুক্ত ছিলেন। এই বিবাহ স্থির হইবার পূর্ব্বে, বিবাহের বিষয় তাঁহাদের জানান হয় নাই। তাঁহারা আরও ভুল সম্বাদ পান যে, কন্যাটি বিধবা-বিবাহের জাতকন্যা। কাজেই তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িলেন। জ্ঞানেন্দ্রের পিতা জমিদার ছিলেন এবং তাঁহার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। কলিকাতা হইতে ছয় মাইল মধ্যে বজবজ রোডের উপর মহেশুলা গ্রামে তাঁহার বাসস্থান। গুণ্ডা লইয়া জোর করিয়া জ্ঞানেন্দ্রকে বাটীতে লইয়া যাইবেন, এই খবর পাইয়া জ্ঞানেন্দ্র উমেশবাবুর বাটীতে আশ্রয় লইলেন। বিবাহের দিনে Police Sergeant বিবাহ বাড়ীর সম্মুখে (৬৫ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা) রাখা হয়। বিবাহের দু'একঘণ্টা পূর্ব্বে নিবারণবাবুর অল্পবয়স্ক দ্বিতীয় পুত্র বিবাহের বাটীর সম্মুখের রাস্তার অপর পার্শ্বে অন্যের অগোচরে দেশী Circus দেখিতে গিয়া হারাইয়া যায়। (ইনি এখন J. C. Mukerjee, Chief Executive Officer, Calcutta Corporation) অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাহাকে পাওয়া যায়। এই সকল বিপত্তি একদিকে। অন্যদিকে নিবারণ বাবুর একান্ত চেষ্টা যে. এই বিবাহ উপলক্ষে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রীতি স্থাপন হয় এবং দুই সমাজের

লোক মিলিয়া আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। অনেক দৌড়াদৌড়ি করিয়াও নিবারণবাবু কৃতকার্য্য হইলেন না। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিলেন না। তখন জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র নিবারণ বাবুকে বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়া বিবাহ দিউন; তাহা হইলে কেহ কোনও আপত্তি করিতে পারিবেন না। নিবারণবাবু তাহাতে রাজী হইলেন।

চারিদিকে গণ্ডগোলের মধ্যে, নোটীশ দিবার পর ১৪ দিন পূর্ণ হইলেই, ইং ১৮৮৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, স্বয়ং নিবারণবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিয়া, নবসংহিতার বিধি অনুসারে কন্যার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর নিবারণ বাবুর কলিকাতাস্থ বাটীতে জ্ঞানেন্দ্রের পিতা আসিলেন। হিন্দুসমাজভুক্ত উপবীতধারী জ্ঞানেন্দ্রের পিতার সহিত নিবারণচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইলে, জ্ঞানেন্দ্রের পিতা জানিলেন যে, নিবারণ বাবু বিধবা বিবাহ করেন নাই, নিবারণচন্দ্রের কন্যা বিধবা-বিবাহ-জাত নহেন, এবং নিবারণচন্দ্র স্বয়ং নবসংহিতার মন্ত্র পড়িয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছেন ও কন্যা-সম্প্রদান করিয়াছেন। তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল, বরকন্যাকে নিজ-বাটীতে লইয়া গিয়া পাকস্পর্শ করান। সকলের ভয় হইল, পাছে কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করেন। সে জন্য কন্যা ও জামাতা তাড়াতাড়ি ভাগলপুরে চলিয়া যান। বিবাহের পূর্ব্বে জামাতার পিতা যে গণ্ডগোল বাঁধান, তাহাতে বিবাহ শেষ পর্য্যন্ত না

হইবারই সম্ভাবনা, এই আশঙ্কা করিয়া নিবারণচন্দ্র তাঁহার কন্যার মন প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। যদিই বিবাহ না হয়, তাহা হইলে কন্যা যাবজ্জীবন যাহাতে অবিবাহিত জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, সেইভাবে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এরূপ উচ্চভাব ও আদর্শ আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিবাহে নিবারণচন্দ্রের ভগবানের উপর অসীম বিশ্বাস ও নির্ভরের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নিবারণচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ঋণ করিয়া বিবাহ-কার্য্য সমাধা করেন। জামাতার তখনও পঠদ্দশা শেষ হয় নাই। M.A. ও B.L. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ভবিষ্যতে জামাতার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, কিছুই ঠিক নাই; একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া, ভবিষ্যতে কি হইবে ভাবনা না করিয়া, নিবারণচন্দ্র অগ্রসর হইলেন। বিশ্বাসী ভক্তের মান ভগবান রাখিলেন। পরিণাম ভালই হইল।

ভক্ত হরিসুন্দর বসু ইং ১৮৮৬ সালেই বনেলীরাজের সেরেস্তায় কার্য্য লইয়া গয়া হইতে ভাগলপুর আইসেন। জ্ঞানেন্দ্র ইং ১৮৮৭ সালে B.L. পাশ করিয়া ভাগলপুরে ওকালতী আরম্ভ করেন। এই বৎসরেই নিবারণ বাবুর প্রথম পুত্র সতীশচন্দ্র Entrance (Matriculation) পাশ করিয়া Scholarship পাইয়া কলিকাতা Presidency College-এ ভর্ত্তি হন।

ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ তখন খুব জমাট ছিল। কয়েকজন ভক্ত ওখানে একত্রিত হওয়ায়, ওখানকার সমাজ খুব সতেজ হইয়া উঠে। ৺বলদেব নারায়ণ এই সময় ভাগলপুরে কয়েক বৎসর প্রচার

করেন—ভাগলপুর সহরের সুজাগঞ্জ বাজারে একটি ক্ষুদ্র কুটরি ভাড়া করিয়া তিনি হিন্দিতে প্রচার আরম্ভ করেন।

সতীশচন্দ্র অল্পদিন Presidency Collegeএ পড়িবার পরই নিবারণবাবু বলিলেন যে, সতীশকে Indian Civil Service পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে; তিনি এই বিষয়ে আলোক পাইয়াছেন এবং হাতে টাকা কড়ি না থাকা সত্ত্বেও উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। জ্ঞানেন্দ্র তাহাতে তাঁহার শ্বশুর মহাশয়কে বলেন যে, হাতে টাকা নাই, অথচ কি সাহসে তিনি এই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে হাত দিতেছেন। একটু হাসিয়া নিবারণবাবু উত্তর দিলেন যে, যখন তিনি স্পষ্ট আলোক পাইয়াছেন, তখন যখন যে টাকার আবশ্যক হইবে, যিনি আলোক দিয়াছেন, তিনিই তাহা জুটাইয়া দিবেন এবং যখন আর টাকার আবশ্যক হইবে না, তখন আর টাকা আসিবে না। আশ্চর্য্য! ভগবানে বিশ্বাসী ধর্ম্মগতপ্রাণ সাধু ভক্তের কথা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গেল।

ইং ১৮৮৭ সালে নববিধান-সমাজের বিহারী প্রচারক পরলোকগত ভাই বলদেবনারায়ণ ভাগলপুরে কার্য্যস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া ভাগলপুরে আইসেন। ইং ১৮৮৮ সালে ব্রাহ্ম কাজি আবদুল গফুর সাহেব ভাগলপুরে ডাক্তারি ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে বোধ হয়, Central Jailএ কাজ করিতেন। তিনি অশ্বারোহণে পীড়িতের বাড়ী যাতায়াত করিতেন। একদিন কয়েকটী গ্রাম্য কুকুর তাঁহার অশ্বের পিছনে ডাকিতে ডাকিতে তাড়া করে। অশ্ব ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ায় ও পরে তাঁহাকে লইয়া পথের পার্শ্বস্থিত খাদে পড়ে। সেখানে তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পথিকেরা দেখে

ও নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে একখানি খাটিয়া আনিয়া, তাহাতে স্থাপন করিয়া, হাসপাতালে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে। সেই সময় ডাক্তার সাহেবের অল্প অল্প জ্ঞান আসে ও তাহাদিগকে হাসপাতালে না লইয়া গিয়া নিবারণবাবুর বাড়ীতে লইয়া যাইতে বলেন। নিবারণবাবুর অর্থকৃচ্ছ্রতা ও অসচ্ছল অবস্থা হইলেও, তাঁহার আতিথেয়তা ও সেবা শুশ্রূষার জন্য তিনি বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন। নিজের অসচ্ছল অবস্থা হইলেও, সে সব বিষয়ে কোনও ত্রুটি হইত না। আতিথেয়তায় তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার বাটীতে অতিথিসেবা যেরূপ হইত, অনেক ধনাঢ্যের বাড়ীতে সেরূপ হইত না। তাঁহার বাড়ী প্রায় কখনই অতিথি-বিহীন থাকিত না। কলিকাতা হইতে সময়ে সময়ে সপরিবারে ৫।৭ জন লোক স্বাস্থ্যলাভের জন্য তাঁহার বাড়ীতে ২।৩ মাস ধরিয়া থাকিতেন, কোন দিন তাহাতে তাঁহার বিরক্তি ছিল না। তাঁহার বাড়ীতে সকলের অবারিত দ্বার ছিল। গফুর সাহেব উপরোক্ত অবস্থায় সন্ধ্যার সময় আসিয়া নিবারণবাবুর বাটীতে উপস্থিত হন। তখন তাঁহার বাটীর সম্মুখের চত্বরে, তিনি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা ও বলদেববাবু কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। হঠাৎ গফুর সাহেবকে তদবস্থায় দেখিয়া ও তাঁহার হাসপাতালে যাইবার অনিচ্ছা জানিয়া, তাঁহাকে যত্ন করিয়া একটী প্রশস্ত ঘরে রাখার বন্দোবস্ত হইল। তখনই ডাক্তার আনা হইল এবং বাড়ীর পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলে এবং বলদেববাবু সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেলেন। দিনরাত্রি সেবা চলিতে লাগিল। মাসাধিক কাল এইরূপ দিবারাত্রি সেবার পর যখন একটু উঠিতে পারিলেন,

তখন ডাঃ গফুর সাহেব নিজের বাসায় গেলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এতদিন ধরিয়া সেবার কোন ত্রুটি হয় নাই; রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া কত গালাগালি করিয়াছেন, সকলে ও বলদেববাবু তাহা ধীরভাবে সহ্য করিয়াছেন। সেবার ত্রুটি কিছুমাত্র করেন নাই। বলদেববাবু স্বহস্তে গফুর সাহেবের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেন।

ইং ১৮৮৮ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে নিবারণবাবুর তৃতীয় পুত্র (ক্ষিতীশচন্দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে ভাই দীননাথ ভাগলপুর আইসেন। সেই সময়ে নিবারণবাবুর পাঁচ বৎসর বয়সের ৪র্থ কন্যা পঙ্কজিনী অসুস্থ ছিল। পেটে প্লীহা হওয়ায় ডাক্তার তিসির পুল্‌টিশ বাঁধার ব্যবস্থা করেন। উৎসবের গোলমালে কয়েক দিন পুল্‌টিশ বাঁধা হয় না। ১২ই মার্চ্চ (১৮৮৯) তারিখে উৎসব শেষ হইলে, ১৩ই মার্চ্চ ভাই দীননাথ বাঁকিপুর রওয়ানা হইলেন। জামাতা জ্ঞানেন্দ্রের সে দিন কাশী ও সর্দ্দি হওয়ায় কাছারী যাইলেন না। সকালে কাগজের নল পাকাইয়া Steam inhale লইলেন। সে সময় কলিকাতার রামেশ্বরবাবুর পরিবার ও সন্তানেরা নিবারণবাবুর বাটীতে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছিলেন। নিবারণবাবুর দ্বিতীয় পুত্র ও রামেশ্বরবাবুর ছেলেরা জ্ঞানেন্দ্রকে বাষ্প টানিতে দেখেন। দুপুরবেলায় নিবারণবাবুর পত্নী পঙ্কজিনীর পেটে কয়দিন পরে পুল্‌টিশ বাঁধিয়া দিয়া, কয়েকদিনের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়েন। ছেলেরা সেই সময়ে কাগজের নল তৈয়ারী করিয়া জ্ঞানেন্দ্রের বাষ্প টানার অনুকরণে খেলা আরম্ভ করে। লাল দেশলাই, যাহা জ্বালিলে প্রথমে আলোক দেখা

যায় না, তাহা জ্বালিয়া কাগজের নলে লাগাইয়া, দেশলাই কাটি ইতস্ততঃ ফেলিতে আরম্ভ করে। পঙ্কজিনী নিকটে দণ্ডায়মান ছিল। সে উহাদিগকে সাবধান করিতে থাকে যে, দেশলাই কাহারও কাপড়ে পড়িয়া জ্বলিয়া উঠিতে পারে। সেই সময়েই একটী দেশলাই পঙ্কজিনীর কাপড়ে পড়িয়া জ্বলিয়া উঠিল। বালিকা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মাতা, অন্য কন্যাগণ ও জ্ঞানেন্দ্র দৌড়িয়া আসিয়া যখন পুল্‌টিশ খুলিয়া ফেলিলেন, তখন দেখা গেল, পেটের অধিকাংশ স্থান পুড়িয়া গিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্র কাছারীর দিকে ছুটিলেন। পথে নিবারণবাবুকে পাইয়া সমস্ত ব্যাপার তাঁহাকে বলিলেন। তিনি অতি শান্তভাবে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন যে, এখন যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করা হউক। জ্ঞানেন্দ্র ডাক্তার নকুড়চন্দ্রকে আনিবার জন্য সুজাগঞ্জ বাজারে ছুটিলেন। ডাক্তার আবশ্যকীয় ঔষধপত্র লইয়া, একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে, জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গে নিবারণ বাবুর বাড়ীতে আসিলেন। ভাই দীননাথকে পথ হইতে ফিরাইবার জন্য টেলিগ্রাম করা হইল। রাত্রে তিনি ফিরিলেন। সমস্ত রাত্র ঔষধ লাগান চলিল। পরদিন সিভিল সার্জ্জনকে আনান হইল। তিনি বলিলেন যে, বালিকা রক্ষা পাইবে না। দিনের অধিকাংশভাগে দারুণ যন্ত্রণা চলিল। বৈকালে যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম হইল, বালিকা দুটি হাত জোড় করিয়া বারবার প্রণাম করিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল, "মা কেঁদোনা; ঐ যে হরিঠাকুর এসেছেন, আমার সব যন্ত্রণা নিবারণ করে দিয়েছেন।" এই বলিয়া মাতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, এবং "ঐ হরি এসেছেন" বলিতে লাগিল। অনন্ত শান্তিধামের প্রবেশপথে এখন

বালিকা। তাহার আর কি জ্বালা যন্ত্রণা থাকিতে পারে? ১৫ই মার্চ্চ, বালিকা নশ্বর পৃথিবী ছাড়িয়া আনন্দধামে প্রবেশ করিল। এত যন্ত্রণার মধ্যেও বালিকা জানিয়াও বলিলনা, কাহার অসাবধানতায় এই দুর্ঘটনা ঘটিল, পাছে সেই বালক তিরস্কৃত হয়। পরে সেই বালক সমুদায় স্বীকার করিল। এই নিদারুণ শোকের মধ্যে নিবারণ বাবু যে কি ধৈর্য্য ও ভগবানে তাঁহার যে কি দৃঢ় বিশ্বাস দেখাইয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের সে ধারণাই হইতে পারে না। বিশ্বাসী ভক্তগণের এইরূপ পরীক্ষার মধ্যেই যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

এই দুর্ঘটনার ২।১ দিনের মধ্যেই আকবর মুকুন্দ God-son যোগেন্দ্র এবং Lady Friend বনমালী ব্রহ্মদাস নামধারী দুইটী যুবক আসিয়া রাত্রে নিবারণ বাবুর অতিথি হয়েন এবং ছাপান নোটিশ দ্বারা জানান যে, তাঁহাদের এমন স্থানে আহারের স্থান করিতে হইবে, যেখানে কোনকালে আমিষ আহার হয় নাই। নিবারণচন্দ্রের সমস্ত পরিবার তখন শোকগ্রস্ত। সেই সময়েও অতিথিদ্বয়ের সৎকার নিবারণচন্দ্র ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে অতি সহিষ্ণুতার সহিত করেন।

ইং ১৮৯০ সালের মার্চ্চ মাসে, স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে ভাই প্রতাপচন্দ্র ভাগলপুরে আইসেন। মন্দিরে উপাসনা ও টাউনহলে বক্তৃতাদি করেন। খুব জমাট বক্তৃতা ও উপাসনাদি হয়। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোকেরাও তাহা খুব উপভোগ করিয়াছিলেন। ২০শে মে, পুরাতন বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ভাগলপুরে একবার আইসেন। তাঁহাকে পাইয়া নিবারণ বাবুর

আহ্লাদের সীমা রহিল না। উভয়ে একত্রে উপাসনাদি সম্ভোগ করিলেন।

১৭ই জুলাই, প্রথম পুত্র সতীশ চন্দ্র I.C.S. পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিয়া সফল হওয়ার সংবাদ আসিল। সেই উপলক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠা দিদি মৃণালিনী আহ্লাদে একটী কবিতা রচনা করিলেন। জামাতা জ্ঞানেন্দ্র ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু নিবারণচন্দ্রের তাহা মনঃপূত হইল না। তিনি জ্ঞানেন্দ্রকে বারবার বলিতে লাগিলেন যে, ওকালতীতে তিনি (জ্ঞানেন্দ্র) কিছুকাল পরে বেশ উন্নতি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষ থাকিতে পারিবেন না। সেজন্য নিবারণচন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা যে, মুন্সেফি পদের জন্য নাম লেখান হয়। ইং ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে তদনুযায়ী জ্ঞানেন্দ্রের নাম (enrolled) লেখান হয়। জ্ঞানেন্দ্র পরে মুন্সেফ, সবজজ এবং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইয়া, ইং ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে অবসর গ্রহণ করিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমিয়ের কার্য্যস্থান এলাহাবাদে বাস করিতেছেন।

ইং ১৮৯১ সালের ৩০শে মার্চ্চ, রাজ বনেলীর বড় মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। নিবারণ বাবু রাজ বনেলীর চাকুরী করিতেন। তাঁহার সাক্ষ্য রাজা পদ্মানন্দের পক্ষে আবশ্যক হয়। রাজা পদ্মানন্দ নিবারণ বাবুর সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুরাগ বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন। সেজন্য অতি সমীহসহকারে জামাতা জ্ঞানেন্দ্রের দ্বারা তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে, মোকদ্দমার বিষয়ে যতটুকু তাঁহার জানা আছে, তাহাই অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিলে বিশেষ বাধিত হইবেন। তাঁহার পক্ষীয় কাউন্সেল্, ব্যারিষ্টারেরা বলিতে লাগিলেন যে,

নিবারণ বাবুর অমুক অমুক জিনিষ জানা উচিত। এবং তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে নিবারণ বাবুর statement চাহেন। যদিও নিবারণ বাবু রাজসরকারের কর্ম্মচারী, তথাপি অন্য সাক্ষীদের ন্যায়, বহুপূর্ব্বে নিজ statement দিতে অস্বীকৃত হন ও বলেন যে, সাক্ষ্য দিবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার statement দিবেন, তাহার পূর্ব্বে দিবেন না। কাজেও তাহাই করিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া গেল। নিবারণ বাবুর চরিত্রের বিশিষ্টতা এইখানেই। ঐ মোকদ্দমা Mr. Wilkins I.C.S. (পরে Justice Wilkins)এর এজলাসে হয়। অনেক গণ্যমান্য সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া হয়, কিন্তু সাক্ষ্য দিবার সময় নিবারণ বাবুকে বসিবার জন্য Chair দেওয়া হয়। তাঁহাকে ও ডাক্তার উমেশচন্দ্র রায়কে ছাড়া, আর কাহাকেও চেয়ারে বসিয়া সাক্ষ্য দিতে দেওয়া হয় নাই। নিবারণ বাবুর ঐ প্রকার সাক্ষ্য দেওয়ায়, রাজা পদ্মানন্দ কিংবা অন্য কেহ অসন্তুষ্ট হইলেন না, বরঞ্চ তাঁহার প্রতি রাজা পদ্মানন্দ প্রভৃতির শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল।

এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে, নিবারণ বাবুর প্রথমা কন্যা মৃণালিনীর দ্বিতীয় সন্তান প্রথম পুত্র (অমিয়) জন্ম গ্রহণ করে। অমিয় Bhagalpur Zila স্কুল হইতে Entrance ও কলিকাতা Presidency College হইতে M.Sc. (First Class in Mathematics) পাশ করিয়া, বেহার গভর্ণমেণ্ট হইতে Scholarship লইয়া, Cambridgeএ গিয়া Wrangler হইয়া আসিয়া, Indian Education Serviceএ ঢুকিয়া, এখন Allahabad Universityর Prof. of Mathematics হইয়াছেন।

সতীশচন্দ্র ইং ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে, বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, বর্দ্ধমানের Assistant Magistrateএর পদে নিযুক্ত হন। ইং ১৮৯৩ সালের শেষভাগে নিবারণ বাবুর পিতা গিরীশচন্দ্র ও মাতা, গিরীশচন্দ্রের অসুস্থতাবশতঃ, ভাগলপুর আসিয়া পুত্রের কাছে থাকেন। ১৮ই নভেম্বর, দ্বিপ্রহরের পরে, নিবারণ বাবুর মাতা নিজ পূজা-সমাপনান্তে, স্বহস্তে নিজ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া যখন আহারে বসিতে যাইতেছেন, তখন হঠাৎ গিরীশচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। সেদিন একাদশী তিথি ছিল। পিতা-মাতা উভয়ে হিন্দুসমাজভুক্ত, নিবারণচন্দ্র উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম ; কিন্তু তাঁহার মাতা বলিলেন যে, গিরীশচন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার সৎকার (মুখাগ্নি) নিবারণচন্দ্রই করিবেন। কার্য্যেও তাহাই হইল। গিরীশচন্দ্রের উদারতা ও তাঁহার পুত্রের ধর্ম্মভাবের প্রতি শ্রদ্ধা, ইহা দ্বারা বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিবারণচন্দ্র ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী পিতার শ্রাদ্ধ সম্পাদন করেন। তাঁহার মাতা কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া হিন্দুমতেও স্বামীর শ্রাদ্ধ দৌহিত্রদের দ্বারা করান।

ই ১৮৯৪ সালে নিবারণ বাবু শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পান, এবং সকলে তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সরোজিনীর বিবাহ সেই সময়ে বরিশাল জেলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত লালবিহারী রায় চৌধুরীর (বন্দ্যোপাধ্যায়) সঙ্গে ঠিক হইয়া, ২০শে জানুয়ারী বিবাহ হয়। এই বিবাহেও, অসুস্থ অবস্থায় নিবারণ বাবুকেই আচার্য্যের ও পুরোহিতের কার্য্য করিতে হয়। এ বিবাহ ভাগলপুরেই হয়। তখন এখনকার মত জাতিবন্ধন এত

শিথিল হয় নাই। বিবাহে উপস্থিত হিন্দু ভদ্রলোকগণের অধিকাংশই বিবাহক্রিয়া শেষ হইলেই, আহারাদি না করিয়াই চলিয়া গেলেন। এখন সকল জাতিই একত্রে সামাজিক কার্য্যে আহারাদি আরম্ভ করিয়াছেন।

ইং ১৮৯৮ সালে জামাতা জ্ঞানেন্দ্র যখন আরার মুন্সেফ ছিলেন, তখন নিবারণ বাবু কয়েকদিনের জন্য সেখানে যান। সেখানে তখন নববিধানবিশ্বাসী ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্র কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেন। তাঁহার ও অন্যান্য ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা, সৎপ্রসঙ্গ কয়েকদিন চলে। সেখানকার অন্যান্য ভদ্রলোকেরা নিবারণচন্দ্রকে পাইয়া এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা ও আলোচনা করিয়া অত্যন্তই প্রীত হইয়াছিলেন।

ইং ১৯০০ সালের জুন মাসে, দ্বিতীয় পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তিনি পরে ব্যারিষ্টার হইয়া প্রত্যাগমন করিয়া, কিছুদিন Bengal Secretariatএ কার্য্য করিয়া, এক্ষণে Calcutta Corporationএর Chief Executive Officerএর পদে নিযুক্ত আছেন। ইং ১৯০১ সালে যখন প্রথম পুত্র সতীশচন্দ্র খুলনা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন ১লা জানুয়ারী, সুপ্রসিদ্ধ প্রিন্সিপাল ডাক্তার P. K. Ray, D.Sc 'র প্রথমা কন্যা চারুলতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইং ১৯০২ সালে, জ্যেষ্ঠ জামাতা মানভূম জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুরের মুন্সেফ ছিলেন। সেই সময় জুন মাসে নিবারণ বাবু সেইখানে যান। দূর হইতে পরেশনাথ পাহাড়, টুণ্ডী পাহাড় ও অন্যান্য স্বাভাবিক দৃশ্য দেখিয়া তিনি অতিশয় মুগ্ধ হন; এবং প্রতিদিন সেই দৃশ্যের মধ্যে বহুদূর বিচরণ

করিয়া, বিশ্বকর্ত্তার অপার কৌশল ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগে কাল কাটাইতেন।

ইং ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে, তৃতীয়া কন্যা কমলিনীর বিবাহ ঢাকার ডাক্তার দুর্গাদাস রায়ের পুত্র, ডাক্তার পরেশরঞ্জন রায়ের সহিত নবসংহিতার বিধিমত হয়। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সেই বিবাহে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। পরেশরঞ্জন কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার ছিলেন। ইং ১৯১২ সালে, অর্দ্ধোদয় যোগের সময়, কালীঘাটে প্লেগের প্রকোপ অত্যন্ত হয়। সেখানকার গলিঘুঁচি পরেশরঞ্জন নিজে দাঁড়াইয়া পরিষ্কার করাইয়া, নিজে প্লেগরোগে আক্রান্ত হয়েন। প্রবলবেগে জ্বর দেখা দিল। নিবারণ বাবু ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় আসিলেন। চিকিৎসা ২।৪ দিন চলার পর, পরেশরঞ্জন নিজ কর্ত্তব্যকাজে নিজকে আহুতি দিয়া, ইং ১৯১২ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে অমরধামে চলিয়া যান।

ইং ১৯০৬ সালে, জ্যেষ্ঠ জামাতা জ্ঞানেন্দ্রের কার্য্যস্থল শ্রীরামপুরে (হুগলী) নিবারণ বাবু কয়েকদিন সস্ত্রীক আসিয়া কাটান। শ্রীরাম-পুরে গঙ্গা ও তাহার পার্শ্বে Strand Road তাঁহার বড় ভাল লাগিত। ইং ১৯১১ সালের মে মাসে, দ্বিতীয় পুত্র জ্যোতিষের বিবাহ মেদিনীপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ কে, বি, দত্তের কন্যা উষার সহিত হয়।

ইং ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে, Theistic Conferenceএ সভাপতিরূপে আহূত হইয়া নিবারণ বাবু একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ

করেন। তাহার পূর্ব্বে ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের চতুস্ত্রিংশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় "Views and Prospects of the Brahmo Somaj" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তাহা পরে মুদ্রিত হয়।

ইং ১৯১৩ সালে জ্যেষ্ঠ জামাতা পাটনায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে নিবারণ বাবু আর একবার পাটনায় যান। ইং ১৯১৪ সালে ভাগলপুরের রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যাঁহার অর্থে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরলোক যাত্রা করেন। ইং ১৯১৫ সালে জ্যেষ্ঠ জামাতা ভাগলপুরে বদলী হইয়া, অন্য বাসা না লইয়া নিবারণ বাবুর গৃহেতেই থাকেন। ইং ১৯১৬ সালে নিবারণচন্দ্রের মাতার মৃত্যু কলিকাতায় হয়।

ইং ১৯১৭ সালে ভক্ত হরিসুন্দর বসু, ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয়েরা দেহত্যাগ করেন। নিবারণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার কনিষ্ঠ পুত্র চিন্ময়চন্দ্র কয়েক বৎসর হইতে হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিল। ঐ সময়ে নিবারণচন্দ্রের বড় জামাতা পূর্ণিয়ার ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিলেন। পুত্র চিন্ময় সেইখানেই থাকিত। তাহার বয়স তখন ১৫ বৎসর। পীড়ার প্রকোপের জন্য তিন বৎসর হইতে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল। বাড়ীতে বালকদের উপযোগী সহজপাঠ্য বিজ্ঞানের পুস্তক, ভাল ভাল গল্পের পুস্তক চিন্ময় পাঠ করিত এবং ময়না, টিয়া প্রভৃতি ১০।১২টী পাখী; সাদা ইঁদুর ইত্যাদি লইয়া দিন কাটাইত। মাঝে মাঝে নিজের মনে কাগজে কত কি লিখিত। ইং ১৯১৭ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর, চিন্ময় চিন্ময়রাজ্যে চলিয়া গেল।

তাহার কাগজপত্রের মধ্যে একটী কাগজে নিম্নলিখিত কয়েকটী লাইন লাল পেন্সিলে লেখা পাওয়া যায়ঃ—

"ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য যখন পূর্ণ হয় না, তখন ইচ্ছার উপর মহৎ ইচ্ছা আছে নিশ্চয়।

"মানুষ সুখে থাকলে ঈশ্বরকে ভুলে যায়, কেবল বাহিরের আমোদ আহ্লাদ নিয়ে থাকে, দুঃখ পেলে ঈশ্বরকে ডাকে, প্রার্থনা করে।

"বাইরের সুখে আত্মার কল্যাণ হয় না, কেবল পৃথিবীতে কয়েক-দিন আহ্লাদ পায়। কিন্তু দুঃখ পেলে, ঈশ্বরের কাছে গেলে, আত্মার কল্যাণ হয়, আত্মা উন্নত হয়, যে আত্মা চিরকাল থাকবে, চিরদিন থাকবে।

"পৃথিবীর দেহ ত কয়েক দিনের জন্য। তাই দয়াময় ঈশ্বর মাঝে মাঝে দুঃখ দিয়ে আমাদের তাঁর কাছে লইয়া যান, যাহাতে আত্মার কল্যাণ হয়। দুঃখ না দিলে আমরা এমন কৃতঘ্ন যে, সুখে থেকে তাঁহাকে ভুলে যাই, কেবল সুখ নিয়ে থাকি।"

পিতা জ্ঞানেন্দ্র এই সকল লেখার ফটো করিয়া রাখিয়াছেন।

দৌহিত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া নিবারণচন্দ্র ভক্ত হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের মধ্যম পুত্র প্রেমসুন্দরকে সঙ্গে লইয়া পূর্ণিয়া যান ও সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া উপাসনাদি করিয়া, চিন্ময়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদনানন্তর ভাগলপুরে ফিরিয়া আইসেন। চিন্ময় গরিবদিগকে খাওয়াইতে ভালবাসিত, তাহার শ্রাদ্ধের দিন সেজন্য দরিদ্রভোজন হয়। ইং ১৯১৮ সালে বড়জামাতা মুঙ্গেরে বদলী হন। নিবারণ-চন্দ্র সেখানে গিয়া কয়েকদিন থাকেন ও উপাসনাদি করেন। মুঙ্গের

জেলায় খরকপুর হ্রদ এবং তত্রত্য পাহাড় ও জঙ্গলের দৃশ্য চমৎকার। মুঙ্গের থাকাকালীন নিবারণচন্দ্র বড় জামাতা ও পরিবারের সকলকে লইয়া সেখানে যান ও একরাত্র সেখানকার দারভাঙ্গা-রাজের ইন্সপেক্‌সন্ বাঙ্গালায় কাটাইয়া, পরদিন পাহাড়, হ্রদ ও জঙ্গলের দৃশ্য দেখেন। ঐ স্থানের স্বাভাবিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়েন। পরে উপাসনা ও আহারাদি করিয়া মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন করেন।

রুগ্নাবস্থা

ইং ১৯২১ সালে নিবারণচন্দ্রের শরীরের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। চিকিৎসার জন্য কিছুদিন সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া থাকেন। পরে ইং ১৯২৩ সালে এলাহাবাদে দৌহিত্র প্রফেসার অমিয়চন্দ্রের বাসায় গিয়া কিছুকাল থাকেন। ইং ১৯২৪ সালে, জ্যেষ্ঠ পুত্র হাওড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সতীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতায় আসেন। সে সময় শরীরের অবস্থা অত্যন্তই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। শরীর তখন ভগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইং ১৯২৫ সালে শরীর যখন আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন কয়েকমাস কলিকাতায় চিকিৎসা হইতে লাগিল। শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, দৃষ্টি ক্ষীণ হইতে লাগিল, তাঁহার অনেকদিনের হার্ণিয়া ব্যাধির প্রকোপ অত্যন্তই বাড়িয়া গেল। চিকিৎসায় কোন উপকারই হইল না। জীবনব্যাপী কার্য্যের ও সাধনের স্থান ভাগলপুরে ফিরিবার জন্য ইচ্ছা বলবতী

হইয়া উঠিল। কাহারও কথা না শুনিয়া সেখানে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে ফিরিয়া আসিয়া বেশী দিন আর জীবিত রহিলেন না। ইং ১৯২৭ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে, তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে স্থানীয় যাবতীয় গণ্যমান্য হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান ভদ্রলোকেরা অতীব শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত যোগদান করেন। কলিকাতা হইতে স্বর্গীয় ভাই প্রমথলাল সেন আসিয়া তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সমাপন করেন। ভাই প্রমথলালের হৃদয়স্পর্শী উপাসনা এবং সুগম্ভীরভাবে শ্রাদ্ধক্রিয়া-সমাপন স্থানীয় নিমন্ত্রিত হিন্দু ভদ্রলোকদিগকে একান্ত বিমুগ্ধ করিয়াছিল। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সময় তাঁহাদের গণ্ডদেশ বহিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, এইত প্রকৃত শ্রাদ্ধ। দেশে যে ভাবে ইহা সম্পন্ন হয়, তাহা হইতে ইহা অনেক উচ্চদরের।

সদ্‌গুণ

নিবারণচন্দ্রের আত্মীয় স্বজনদিগের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান যেরূপ ছিল, সাধারণতঃ সেরূপ দেখা যায় না। তিনি প্রথম জীবনে অর্থ-কষ্টে কাটাইয়াও আজীবন আত্মীয়দের ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের, বিশেষভাবে তাঁহার ভগ্নী, ভগ্নীপতি, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীদের সম্পূর্ণ পরিপোষণের ব্যয়, বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়, বিবাহাদির ব্যয় অকাতরে বহিয়া আসিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার মত কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও সহৃদয়তা প্রায়ই চক্ষে পড়ে না।

অন্য লোকের সম্বন্ধেও কর্ত্তব্যপালনে তাঁহার ক্রটী দেখা যায় নাই। অপরিচিত কোন লোক ভাগলপুরে আসিয়া বিপন্ন অবস্থায় পড়িলে, নিবারণচন্দ্র আগ্রহের সহিত তাঁহার কষ্ট ও অসুবিধা মোচনের জন্য তৎপর হইতেন। কোথায় কে কখন অসুস্থ অবস্থায় ভাগলপুরে আসিয়াছেন, তাঁহাদের কি অভাব অসুবিধা, ইহা প্রাতর্ভ্রমণ সময়ে খোঁজ খবর লইতেন ও তাহার প্রতিকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। সাধ্যমতে চিরকাল নানা লোককে নানাপ্রকারে সেবা ও সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন এবং ভালকাজে সাধ্যমত দানও করিতেন। অর্থের সচ্ছলতা না থাকিলেও, অতিথি-সেবা ও লোকজনকে পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইতে অত্যন্তই ভালবাসিতেন। অতিথিসেবার জন্য তিনি চিরপ্রসিদ্ধ ছিলেন। দূরদেশ হইতে আসিয়া কত লোক সপরিবারে মাসের পর মাস তাঁহার বাটিতে অতিথিরূপে থাকিয়া, স্বাস্থ্য পুনঃ লাভ করিয়া গিয়াছেন।

পরিবারে কিম্বা পাড়ায় কেহ পীড়িত হইলে, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা এবং তাঁহার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত নিখুঁতভাবে এবং অকাতরে করিতেন। একদিনের জন্যও তাহাতে বিরক্তির ভাব ছিল না।

শোকতাপ সহ্য করিবার তাঁহার ক্ষমতা প্রকৃত বিশ্বাসী ও ভক্তের উপযোগীই ছিল। আত্মীয়-বিয়োগে কখনও তাঁহাকে বিচলিত বা অভিভূত হইতে দেখা যায় নাই।

তাঁহার ভগবদুপাসনা অতিশয় গভীর ছিল। বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা তাঁহার ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইত। যে কেহ তাঁহার উপাসনায় যোগ দিতেন, তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেন যে,

উহা নিবারণচন্দ্রের আজীবন নিষ্ঠার সহিত সাধনের ফল। জীবনে যে তিনি সমন্বয়-যুগধর্ম্মের সকল দিকই সাধন করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইত না। উপাসনাকালে তাঁহার প্রত্যেক কথাটী যেন সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে বলিতেন, ইহা বেশ বুঝা যাইত। বৃথা বাক্য একটীও তাহাতে থাকিত না। বর্ত্তমান সমন্বয়-যুগধর্ম্মের সর্ব্বদিক সাধন একই জীবনে এরূপ অল্পই দেখা গিয়াছে। নিজেকে প্রচার করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। সেই জন্য, তাঁহার কি অমূল্য গুণাবলী, নিষ্ঠা ও সাধন ছিল এবং তাঁহার জীবন যে কত উন্নত, উদার, পবিত্র ও স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ ছিল, ঘনিষ্ঠভাবে যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিয়াছিলেন, তাঁহারাই কেবল তাহা জানিতে পারিয়াছেন। দুই চারখানি পুস্তক তিনি প্রণয়ন করেন। "মানবজীবন" নামে একখানি বাঙ্গালা পুস্তকে মনুষ্যজীবনের অত্যাবশ্যক অনেকগুলি বিষয়ের বিশদভাবে মীমাংসা করিয়াছেন। যুবকদিগের শিখিবার অনেক জিনিষ তাহার মধ্যে আছে। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, দৃষ্টি অতিশয় ক্ষীণ সত্ত্বেও, আহারান্তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্তক্ষণ নিয়মিতভাবে বসিয়া, এই "ব্রহ্মতত্ত্ব" পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজিতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও "Views and Progress of the Brahmo Somaj" তিনি প্রণয়ন করেন। তাহা ছাড়া তাঁহার খাতায় একখানি ইংরাজি পুস্তক লেখা আরম্ভ করিয়া যান; কিন্তু তাহা আর সমাপ্ত করিবার অবসর পান নাই।

বয়স্থা মহিলাদের শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হইয়া, নিজ

সহধর্ম্মিণীকেও যেমন, তেমনি নিজ মাতা ও ভগ্নীকেও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল পরলোকগত অতুলচন্দ্র মল্লিক (পরবর্ত্তী কালে ব্যারিষ্টার Mr O. C. Mullik) পাটনা হাইকোর্টের জজ পরলোকগত Justice B. K. Mullikএর পিতা ছিলেন ; তাঁহারই গৃহে বয়স্থা মহিলাদের শিক্ষা দিবার স্থান ব্যবস্থা করিয়া, স্বয়ং নিবারণচন্দ্র, যদুনাথ ঘোষ ও ব্রজকিশোর বসু মহাশয়গণ তথায় শিক্ষকের কার্য্য করিতে থাকেন। কিছুকাল সে কার্য্য সুন্দরভাবে চলিয়াছিল। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে স্থানীয় মহিলাসমাজ, সঙ্গতসভা, Youngmen's Theistic Association, Night School প্রভৃতির তিনি হয় প্রতিষ্ঠাতা কিম্বা মেরুদণ্ড (back-bone) ছিলেন। ১৯০২ খৃঃ অব্দে তাঁহারই চেষ্টায় ভাগলপুরে একটী Debating Society স্থাপিত হয়। তাহাতে ভাগলপুরের সকল শ্রেণীর গণ্যমান্য হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টিয়ান ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। তাহার কার্য্য কয়েক বৎসর ধরিয়া উৎসাহসহকারে চলিয়াছিল।

নিবারণচন্দ্রের সর্ব্ববিধ সংস্কারের ভাব অতিশয় প্রবল ছিল। জাত্যাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া দেশের লোকদিগকে স্বদেশের ও স্বজাতির পক্ষে মঙ্গলকর কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত দেখিয়া, তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। অমুক অমুক কার্য্য ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ বংশের লোকের কার্য্য নয়, এই কুসংস্কারে বদ্ধ হইয়া লোকেরা নিজেদের উন্নতির পথ অবরোধ করিয়া রাখিয়া আসিতেছেন, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। স্বয়ং সদ্‌ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব হইয়াও, এ বিষয়ে উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইবার ইচ্ছা তাঁহার প্রাণে বলবতী হইল। তিনি

নিজের কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্রকে চামড়ার কাজ (Tanning) শিক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র যোগ্যতার সহিত সে কার্য্য শিক্ষা করিয়া, Leeds Universityর B.Sc. Degree লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। হস্তে অর্থ না থাকায়, আপাততঃ ক্ষিতীশচন্দ্রকে কয়েক বৎসর স্থানীয় T. N. Jubilee Collegeএ Professor of Chemistryর কার্য্য করিতে হয়। তৎপর কিছুদিন কলিকাতায় National Tanneryতে কার্য্য লইয়া, চামড়ার কার্য্যে এ দেশের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। পরে নিবারণচন্দ্রের একান্ত ইচ্ছায় ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিলে, পিতা, পুত্র ও অন্য কয়েকটী বন্ধু মিলিয়া একান্ত চেষ্টায়, Bhagalpur Tanneryর প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষিতীশচন্দ্র উহার Expert ও Managing Agent নিযুক্ত হয়েন। প্রথম কয়েক বৎসর Tanneryর কার্য্য ভাল ভাবেই চলিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের লোকের উপযুক্ত সহানুভূতির অভাবে, কার্য্য চালাইবার মত অর্থ সংগৃহীত হইল না। একটী Working Fund হইতেই পারিল না। কার্য্য চালাইবার জন্য অর্থের অভাব হইলে, নিবারণচন্দ্রের হাতে তাঁহার কলিকাতাস্থ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাটী বিক্রয়ের যে টাকা ছিল, তাহা হইতে টাকা দিতে লাগিলেন। ওদিকে যে চামড়া Tannery হইতে প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা উৎকৃষ্ট ইংরাজী চামড়ার সদৃশ হওয়ায়, নানা দিক হইতে order আসিতে লাগিল; কিন্তু সেই সব order supply করিবার জন্য যে অর্থ আবশ্যক, তাহার অনটন হইল। ক্ষিতীশচন্দ্রের Managing Agent ও Expert স্বরূপে যে বেতন পাইবার

কথা ছিল, তাহার যৎসামান্য মাত্র লইয়া বাকী টাকা Tanneryর কাজেই ব্যয় করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে ঋণ করিয়াও কার্য্য চালান হইল। অন্যের নিকট যে সাহায্য আশা করা গিয়াছিল, তাহা পাওয়া গেল না। এ অবস্থায় কার্য্য অতি সংকীর্ণ হইয়া পড়িল।

নিবারণচন্দ্র ও তাঁহার স্বজনবর্গ ইহাতে অনেক অর্থ দিয়াছেন। নিবারণচন্দ্র ইহাতে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, নিজের অর্থ দিতে কিছুই সঙ্কোচ করেন নাই। ক্ষিতীশচন্দ্র পারিশ্রমিকের যৎসামান্য অংশমাত্র পাইলেও, প্রাণপণ করিয়া ট্যানারির কাজ করিয়া আসিয়াছেন। অন্যত্র কাজ লইলে, তিনি অর্থ-সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিতে পারিতেন; কিন্তু পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টায় তাহা করিলেন না।

পরিশিষ্ট

ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের অধিবেশন।

১২ই এপ্রেল ১৮৭৮।

উপস্থিত—শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রামেশ্বর দাস
রামলাল
ললিতমোহন ঘোষ
বামাচরণ ঘোষ
নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক

২। নিবারণবাবু প্রস্তাব করিলেন এবং অধিকাংশের সম্মতিতে গৃহীত হইল যে, যতদুর সংবাদপত্র হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে ও যতদূর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের জীবন সাধারণে জানা আছে, তাহা হইতে বোধ হয়, বর্ত্তমান বিবাহেতে তাঁহাকে পৌত্তলিকতা-দোষে দোষী ও বাল্যবিবাহ অপরাধে অপরাধী বলা যায় না। কিন্তু এ বিবাহে পাত্র-পাত্রীর বয়স ব্রাহ্মসমাজের গ্রাহ্য বিবাহ-পদ্ধতির সম্পূর্ণ অনুগত হইয়াছে বলা যায় না এবং ইহাও বলিতে হইবে যে, কেশববাবুর কতক অবিবেচনা ও ব্যস্ততাপ্রযুক্ত বিবাহেতে পৌত্তলিকতার সংস্রব আসিয়াছে। এ সকল কারণে তাঁহার কন্যার বিবাহ আমাদের নিকট অনুমোদনীয় নহে।

৩। ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর ১লা এপ্রেল তারিখের পত্র-পাঠাস্তে, রামাচরণ বাবুর প্রস্তাবে, ললিতমোহনবাবুর পোষকতায় ও সর্ব্ব-সম্মতিতে স্থির হইল যে, যদিও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সম্পাদকের কন্যার বিবাহ ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের অনুমোদিত নহে এবং তজ্জন্য উপরোক্ত প্রস্তাবে কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাকে দোষী করা হইয়াছে, তথাপি, যে হেতু বর্ত্তমান সম্পাদকের সে দোষ সত্ত্বেও তাঁহার উপর যেরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, তদপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধেয় সম্পাদকের উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখা যাইতেছে না। আমাদের অভিপ্রায়, বর্ত্তমান সম্পাদককে পদচ্যুত করা বিধেয় নহে।

Trust Deed of the Bhagalpur Brahmo Samaj Mandir to be executed by the present Secretary Babu Nibaran Chandra Mukherjee.

This indenture executed on the *12th day of October, 1916* by me Nibaran Chandra Mukherjee, son of Babu Giris Chandra Mukherjee deceased of No. 11 Guru Prosad Chowdhury's Lane Calcutta, residing formerly in Mohalla Mohiuddinchak and now Moshakchak in the town of Bhagalpur, Thana, Sub Registration Office and District of Bhagalpur, by profession a retired Vakil, Secretary of the Brahmo Samaj Bhagalpur of the First party, and

(1) Babu Prem Sunder Bose, M.A., Professor, Tej Narain Jubilee College, Bhagalpur;
(2) Babu Khitish Chandra Mukherjee, B.Sc., Professor, Tej Narain Jubilee College, Bhagalpur;
(3) Babu Lal Behary Roy Chowdhury, B.L., Pleader, Banka, District Bhagalpur;
(4) Babu Basant Kumar Chatterjee, Supervisor, District Board, Bhagalpur;
(5) Babu Prabhat Chandra Ghose of Raja Surendra Narain Road, Bhagalpur;

herein after called the Trustees of other part.

Whereas a plot of land about thirteen Cottahas more or less in quantity by local measurement Kamarband, situated in Mohalla, Adampur, in the town of Bhagalpur in the District Sub Registration Office and Thana Bhagalpur bounded:

on the East—By the Municipal Public Road called the Wace Road;

on the West—By the compound and house of (at present) Babu Durga Prasad, situated on the Makarari land of late Raja Shib Chandra Banerjee;

on the North—By the private road the approach to the said house of Babu Durga Prasad and then the garden and Mokarari land of late Raja Shib Chandra Banerjee; and

on the South—By the lands and compound and compound walls of the Maharaja of Gidhaur and also a piece of waste land belonging to the estate of the late Babu Madhu Sudhan Sirkar;

was obtained by the Bhagalpur Brahmo Samaj for the purpose of having built on it a Mandir for the worship of the One, Infinite, Formless, All-Merciful Deity and for other similar purposes on an Annual rent of Rupees Six and annas Eight only (Rs. 6/8/-) under a registered darmokarari lease dated 12th of June, 1879 executed by the late Raja Shib Chandra Banerjee as the Mokararidar of the

said land, under the Zemindar the late Babu Gopi Nath Ghose deceased, in favour of the First Part as the Secretary of the said Bhagalpur Brahmo Samaj and whereas subsequent to the acquisition of the said land by the Bhagalpur Brahmo Samaj, a pucca brick-built building called the Bhagalpur Brahmo Samaj Mandir was erected on it through the very kind munificence of the said late Raja Shib Chandra Banerjee by the said Bhagalpur Brahmo Samaj for the purpose of having the said Divine Worship regularly held therein and other similar purposes and whereas the said Mandir was opened in January, 1881 and has since then been all along used by the members of the Bhagalpur Brahmo Samaj always for such regular Divine worship and similar other purposes approved by them and whereas no regular Deed of Trust in respect of the said land premises messuages, hereditaments and appertenances thereto has yet been executed and as it is very necessary to have such a Trust Deed executed.

Now this Indenture therefore witnesseth that in consideration of the premises set forth above and with a view to the carrying out of the purposes without any future inconvenience for which the said Mandir has been erected and to the better management and preservation of the said lands, buildings and garden attached thereto, the compound walls, trees, furniture and any that may be hereafter acquired, erected and added to and all rights, titles,

easements, hereditaments appertenances whatsoever connected with and attached to the same and in confirmity to the resolution passed by the members of the Bhagalpur Brahmo Samaj in a regular meeting of them held on the 29th August, 1915, this Trust Deed is executed by the said Nibaran Chandra Mukherjee as Secretary of the said Bhagalpur Brahmo Samaj and as the person in whose name the said properties now stand, it is hereby declared as follows:—

That I Nibaran Chandra Mukherjee appoint and constitute,

(1) Babu Prem Sunder Bose, M.A., Professor, Tej Narain Jubilee College, Bhagalpur;

(2) Babu Khitish Chandra Mukerjee, B.Sc., Professor, Tej Narain Jubilee College, Bhagalpur;

(3) Babu Lal Behary Roy Chowdhury, B.L., Pleader, Banka;

(4) Babu Basant Kumar Chatterjee, Supervisor, District Board, Bhagalpur;

(5) Babu Prabhat Chandra Ghose, Raja Surendra Narain Road, Bhagalpur;

as Trustees to hold and possess the said lands, buildings, walls, gardens, trees, furniture and all properties connected therewith which are all estimated to be of the total value of Rupees Two thousand only (Rs. 2,000/-) and which I hereby convey to and vest in them and their successors for the time being

in order to have the purposes of the Bhagalpur Brahmo Samaj in respect of the said premises carried out properly and adequately subject to terms and conditions enumerated below:—

1. The Trustees will have all and every power of management given to them by law in respect of the properties vested in them as Trustees and also every power of representing the properties in all proceedings in Court or before official or public bodies. They will have every such power over them consistent with the purposes of this Trust. If any additions, alternations, improvements or otherwise be hereafter made to the premises now existing including the lands, garden, trees, buildings, edifices, structures or anything, all that will be considered and taken to be as part and parcel of the premises hereby vested in the Trustees and forming part of the properties under their control and management.

2. The premises vested in the Trustees shall be used and utilised for all purposes approved by the members of the Bhagalpur Brahmo Samaj such as Divine Service and edifying meetings, conversations, discourses, addresses, lectures and such and similar other purposes all approved of by the members of the Bhagalpur Brahmo Samaj and the worship and other religious proceedings to be held therein shall be the worship of only God the One Omnipresent, the Eternal, the Formless, the All-Powerful, the All-Creating, the

All-Merciful, the All-Holy, the All-Perfect, the All-Just and the All-Good and All-Beautiful and of none else: no created being, no man, no inferior animal, no material or spiritual object will be worshipped here as God or as equal to, or incarnation of God, and no prayers, hymns, adorations or such will be here offered to any, or in the name of any, but the living Infinite God: no engraving, sculpture, picture, image, symbol or external sign or representations or any such shall be kept or used here for the purpose of being worshipped whether the same has ever been or will ever be used or not by any sect or community for purposes of worship or for memorializing any event: but any such or any created being or object that may be or may have been or will be used by any sect or community as sacred shall not be treated with or put to ridicule or contempt here: no animal life will be killed or sacrificed here save as may be needed for the safety or security of human life: save what may be necessary for the preservation of life or purposes of relieving pain or discomfort, there will be had here no eating or drinking whatever of any kind: the premises will not be used for any entertainments or factious disputes and quarrels: no book will be used here as infallible and sent by God, but no book or books which are or will be held so by any sect or community will be put here to any ridicule or contempt: no person, sect or community will be the

subject here of any malice or slander: in the Divine services, adorations, prayers, hymns, sermons, lectures, discourses, addresses and worship and such that will be had here, no approval or encouragement is to be or will be given to idolatry sectarianism and vice; but all Divine services, adorations, prayers, hymns and such shall be so conducted as to lead to Universal fellow feeling and love among men in spite of difference in sex, caste, creeds, races and circumstances, and to the attainment of pure knowledge and love, Bhakti, purity and good life, in expurgation of error and sin and to communion with the Deity.

3. The Bhagalpur Brahmo Samaj consisting of the Brahmos and the members of their families resident for the time being in the locality and the congregation of the Mandir consisting mainly of them have all along hitherto managed all matters connected with the said premises now vested in the Trustees: and the Trustees shall in future manage the same in accordance with the wishes of the same body: should any differences arise which Heaven forbid in the same body in the future, the Trustees would try to make such arrangements in the Mandir as might enable the different contending parties to use it according to their respective wishes, one not interfering with another.

4. The Bhagalpur Brahmo Samaj have always appointed their Secretary, Assistant Secretary and

Minister, and through them or otherwise have all along managed matters connected with the Mandir: the Trustees shall in future allow them to do the same and manage, use and utilise the premises in the same way: but if they find that the agents of the Bhagalpur Brahmo Samaj are acting in infringment of the principles laid down in this Trust Deed and on representation do not adopt rectification, they shall have the power to interfere and stop such proceedings.

5. The Trustees will act by taking votes among themselves in a meeting or by letter: in case of difference of opinion among them the opinion of the majority shall prevail. There shall always be five Trustees in number: in case of the death, resignation, or continued serious disability of a Trustee or Trustees, and who does not take special interest in the Bhagalpur Brahmo Samaj: in case of a Trustee or Trustees suffering from continued serious disability, the other Trustee or Trustees and the members of the Bhagalpur Brahmo Samaj shall have power by a majority of votes to remove him or them and appoint successor or successors.

6. The expenses connected with all matters concerning the premises vested in the Trustees have all along been defrayed by the Bhagalpur Brahmo Samaj out of contributions made by themselves and out of kind donations raised from outside persons;

the Trustees will allow this to be done in the future and shall look after the repairs and upkeep of the premises and shall cause the rent of the land to be paid regularly to the Mokararidar by the Secretary of the Bhagalpur Brahmo Samaj in accordance with the terms of the lease.

7. If in the future additions, alterations, improvements and such have to be made to the premises in the shape of acquiring lands raising buildings, edifices, erections, gardens, trees, furniture, books and such others, the Trustees shall cause the same to be made in conjunction with and according to the wishes of the Bhagalpur Brahmo Samaj.

8. In case of outsiders unconnected with the Bhagalpur Brahmo Samaj requesting permission to use the premises vested in the Trustees for purposes falling within the principles and the scope of this Trust Deed the latter will have only after consulting the wishes of the Bhagalpur Brahmo Samaj and in accordance therewith power to grant such permission.

9. If ever in the future the Bhagalpur Brahmo Samaj (which Heaven forbid) will cease to exist then the Trustees for the time being, will have the power to make over the premises for use to any local public body for the time being in Bhagalpur for conducting educational and moral institutions, consistent with the spirit of the Trust Deed, for the time as the Brahmo Samaj may not be revived and failing

that to the Brahmo Samaj at Calcutta being either the New Dispensation Church or the Sadharan Brahmo Samaj or such other whichever will appear to them to be working for the greatest and best public good.

Accordingly I the above named Nibaran Chandra Mukherjee, Secretary Bhagalpur Brahmo Samaj in whose name the lease of the land stands in sound mind and full consent set down my signature on the date and year above mentioned.

Trustees
of the First Part
and

(1) (Sd.) Prem Sunder Bose,
(2) ,, Khitish Chandra Mukherjee,
(3) ,, Lal Behari Roy Chowdhury,
(4) ,, Basant Kumar Chatterjee,
(5) ,, Prabhat Chandra Ghose,

of the other Part

Witnesses.